Murdered in Midnight
By
Alistair Maclin
Bengali Version
By
Nirmal Kanti Ghosh

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৬৫

প্রকাশিকা ঃ
শ্রীমতি আলোরাণী পাত্র
প্রগতি প্রকাশনী
অফিস
২৮এ, পঞ্চানন ঘোষ লেন,
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ ঃ
প্রদোষ কান্তি বর্মন

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীগৌর চন্দ্র জানা
আদ্যাশক্তি প্রিণ্টার্স
২৪০/২সি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৬

সবে ভোর হয়েছে। লণ্ডনের একটা পাড়া গাঁ। এখান থেকে শহর বেশ দূরে। শহরের হাওয়া এখানে এসে এখনো লাগেনি। হাওয়ায় একটা ঠাণ্ডা ভাব। গত রাতে টিপ টিপ করে অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি হয়েছে। আকাশে মেঘ ভোর থেকেই ছিল। দুপুরের দিকে একটু বৃষ্টি হলেও সারাদিন ভালোই ছিল, কিন্তু সন্ধ্যের পর থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়। অবশ্য লোকেরা এত ধরনের বৃষ্টিতে অভ্যস্ত। প্রায় সময়ই তাদের সঙ্গে বর্ষাতি বা ছাতা থাকে।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। তার উপর বৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রায় বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। রাস্তায় প্রায় জনশূন্য। হয়তো অনেক পরিবারই ঘুমে কাতর। একান্ত দরকার ছাড়া এই পরিবেশে কেউ ওঠে না। রাস্তায়ও বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বের হয় না।

কিন্তু একটা পরিবারের সবাই জেগে আছে। এমন কি ঠিকে কাজের লোক মেরি পর্যন্ত বাড়ি যেতে পারেনি। বাড়িতে কাজ করে ঠিকই, কিন্তু তার ও তো একটা মায়া দয়া বলে জিনিষ আছে।

জেগে থাকার পরিবেশটা হলো এ রকম। এ বাড়ির বড় মেয়ের নাম রোজি। সে বিবাহিতা। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ হবে। তবে চেহারার বাঁধুনি ভালো। তত মনে হয় না, আর মেয়েদের বয়স হুট করে বোঝাই যায় না। প্রায় সময়ই মেক-আপে থাকে।

রোজি একটা চেয়ারে বসে আছে। অলস ভঙ্গি। দু'চোখ লাল। বসে থাকতে থাকতে কোমড় ধরে গেছে। ব্যথায় পিঠ টন টন করছে। মুখে একটা চিন্তার ছাপ। ফলে মুখটা বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। অন্য সময় মেকাপে থাকলেও এখন একবারে মেক আপ নেই। মাথার চুলও এলোমেলো রুক্ষ। সে চুলে গতকাল এক ফোঁটাও তেল পড়েনি। দেবার মত তার মানসিকতাও ছিল না। কেমন যেন একটা অশান্তিতে তার মন ছেয়ে আছে।

রোজির এক ছেলে। নাম টম, বয়স আট। পাশের ঘরে অকাতরে ঘুমিয়ে চলেছে। গতরাতে শুতে যাবার আগে সে মাকে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে, মা, দাদু এখনো ফিরছে না কেন? রোজি এর কোন জবাব দিতে পারেনি। শুধু ছেলেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছে, কাজে গেছে। তাই ফিরতে একটু দেরি হচ্ছে। একটু পরেই ফিরে আসবে। যাও, তুমি এখন গিয়ে শুয়ে পড়ো।

তবু টম যায়নি। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা মাকে জিজ্ঞেস করছে। মা বিরক্ত হতে গিয়েও বিরক্ত হয়নি। নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিয়েছে, তুমি সকালে

ঘুম থেকে উঠে দেখবে যে দাদু বাড়িতে এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে মনে মনে করুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে, ঠাকুর তাই যেন হয়। নইলে ছেলের কাছে সে মিথ্যেবাদী বলে প্রতিপন্ন হবে।

রোজির মুখোমুখি আর একটা চেয়ারে সুশান বসে আছে। সুশান রোজির বোন। ও কাল সারা রাত দু' চোখের পাতা এক করতে পারেনি। তার চোখ দুটোও লাল হয়ে উঠেছে। একটু জ্বালাও করছে। চোখে বার দুয়েক হাত কচলে নিলো। পর পর গোটা তিনেক হাই তুললো। তাকে খুবই ক্লান্ত, অবসন্ন দেখাচ্ছে।

কেউ কোন কথা বলছে না। কোন রকম কথা বলার মত কারুর মানসিকতাও নেই। দু'জনেই দারুণভাবে ভেঙে পড়েছে। ওদের চোখ মুখের অবস্থা যেন তাই বলে দিচ্ছে।

ওদের মাঝে মেরী এসে দাঁড়ায়। সেও কোন কথা বললো না। শুধু ধুমায়িত দু'কাপ কফি রেখে চলে গেল।

দু'জনে কফির দিকে একবারও ফিরে তাকায় না। কফি যেমন সেণ্টারিং টেবিলে পড়ে আছে, তেমনি পড়ে থাকে।

রোজি যে কফি দেখেনি তা নয়, তবুও তাতে চুমুক দিতে পারছে না। কেমন যেন একটা বিস্বাদ লাগছে। অথচ গত রাতে বৃষ্টি হবার ফলে বেশ ঠাণ্ডাও পড়েছে। তবে দরজা জানলা সমস্ত কিছু বন্ধ থাকায় ঠাণ্ডার তীব্রতা কিছু কম মনে হচ্ছে।

রোজি সুশানের দিকে তাকায়, নে কফি খা। দেখবি কিছুটা ভালো লাগবে। বলে সে একটা কাপ ট্রের উপর থেকে তুলে নেয়।

—দিদি, আমার খেতে একবারে ইচ্ছে করছে না।

—খেয়ে নে। আমরা যা ভাবছি তেমন কিছুই নয়। দেখবি, বাবা একটু পরেই ফিরে আসছে। তার কিছু হয়নি।

—তবু বাবা না ফেরা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। সেই কাল দুপুর থেকে এখনো ফেরার নাম নেই।

—সে কথা ভেবে আমিও তো অবাক হয়ে যাচ্ছি।

—সঙ্গে বেশ কিছু টাকা থাকবে আরো। তাই ভালোর চেয়ে এখন আবার খারাপটাই আগে মনে হচ্ছে। আমার জন্যই বাবার এ অবস্থা হলো। বলে সুশান নিজেকে দোষারোপ করতে থাকে।

—না, না, তুই নিজেকে দোষী ভাবছিস কেন। এতে তোর তো কোন হাত নেই। রোজিকে এ কথা বলে বোনকে বোঝাতে চায়।

—কিন্তু আমার মন তো সে কথা মানতে চাইছে না। সুশানের চোখ দুটো সহসা জ্বালা করতে থাকে।

—না, নে, ওসব কথা না ভেবে এখন কফি খা।

—দিদি, আমি পারছি না।

—ঠিক পারবি। নে খা, তাছাড়া, তোর এখন শরীর নষ্ট করা চলে না।

—আর শরীর! সুশানের ভেঙে পড়া গলা, আমার এখন আর একটুও ভালো লাগছে না। শেষে দিদির পেড়াপেড়িতে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে কফির কাপ ট্রের উপর থেকে তুলে নেয়।

রোজি বলে, বাবা বারোটা নাগাদ বেরিয়েছে। ব্যাঙ্কে আর কতক্ষণ লাগতে পারে। টাকাটা ক্যাশ করেই চলে আসার কথা।

—আমিও তো সেই একই কথা ভাবছি। কাল সারাদিন গেল, সকাল হয়ে গেছে। এখনো তার ফেরার নাম নেই।

—অথচ বাবা যে কোথাও যাবে সে কথা বলেওনি।

—না, না, বাবার কোথাও যাবার কথা নেই। থাকলে বাবা নিশ্চয়ই বলে যেত। তাছাড়া ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, বাবা কখনো এরকম বেহিসেবি কাজ করে না।

—সেই জন্যেই তো আমি এত ভয় পাচ্ছি। নিশ্চয়ই কোন বিপদ-আপদে জড়িয়ে পড়েছে।

—না, না, ও কথা বলিস না।

ইতিমধ্যে কলিং বেলের আওয়াজ হতে রোজি এবং সুশান কফির কাপ রেখে দৌড়ে দরজার কাছে ছুটে যায়। গিয়ে সশব্দে দরজাটা খুলে বাইরের দিকে তাকায়।

দু'জনেই আশাহত হলো। দুধওয়ালা দুধ রেখে কলিং বেল বাজিয়ে চলে গেছে। এটা ও রোজই করে।

রোজি দরজা দিয়ে আবার চেয়ারে ফিরে আসে। কফির দিকে আর মন গেল না। মনটা তার বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে।

সুশানও ধপাস করে চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দেয়। সে কফির কাপের দিকে একবারের জন্যও ফিরে তাকালো না।

রোজি সহসা হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে ডায়াল করতে থাকে। এনগেজ, আবার ডায়াল করে।

—কোথায় ফোন করছিস? সুশান জানতে চায়।

—হাসপাতালে ফোন করছি।

—এ নিয়ে তো পাঁচ সাতবার করলি।

—স্থানীয় হাসপাতাল ছাড়া আরো তিন চারটে হাসপাতালে ফোন করেছি। ওরা অ্যাকসিডেন্টের খবর থাকলে বলতে পারবে।

—ও কথা বলিস না।

রোজি এবার লাইন পেয়ে যায়। হ্যালো গুডমর্নিং।

—মর্নিং। ইনকোয়ারি।

—মিঃ রবার্ট গোমস্ বলে কেউ আপনাদের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে? বলে রোজি রিসিভারটা জোরে কানে চেপে ধরে।

—রবার্ট গোমস্? সময়টা কখন হতে পারে?

—কাল দুপুরের পর থেকে।

—একটু ধরুন।

—ঠিক আছে। রোজির যেন নিশ্বাস পড়ছে না।

—না, এ নামের কেউ এখানে কাল সকাল এগারোটার পর থেকে এখন পর্যন্ত এ হাসপাতালে ভর্তি হয়নি।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, কোন খবর থাকলে দয়া করে আমায় একটু জানাবেন? আমার ফোন নাম্বারটা দিচ্ছি।

—নিশ্চয়ই। আপনার ফোন নাম্বারটা দিন। রোজি বাড়ির ফোন নাম্বার জানিয়ে বলে, আপনাকে আবার ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।

—না, না, এটা আমাদের ডিউটি, রাখছি।

—ঠিক আছে।

রোজি ফোন নামিয়ে রাখতে সুশান বলে, দিদি, মিঃ স্টিভকে একবার ফোন করলে হয়।

খুব ভালো বলেছিস, রোজি সায় জানায়। বাবা মাঝে মধ্যে ওঁর বাড়ি যায়। দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব আছে। বাবা ওঁর নাম প্রায়ই বলে। তাই ওঁর কাছে কোন খবর পেলেও পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া, উনিও তো প্রায় আমাদের বাড়ি আসেন। রোজি একবার ডায়েল করতেই লাইন পেয়ে যায়, হ্যালো মর্নিং। আমায় একটু মিঃ স্টিভকে দেবেন।

—গুড মর্নিং। আপনি কে কথা বলছেন?

—আমি মিঃ রবার্টের বাড়ি থেকে ফোন করছি।

—ধরুণ। আমি ওনাকে ডেকে দিচ্ছি।

—ধন্যবাদ। রোজি ভাবে। আর কাকে ফোন করা যেতে পারে। তবে এখানে যদি তেমন কিছু জানতে পারে, তাহলে আর দরকার নাও হতে পারে। সে সম্ভাবনা আছে কি না তা কে জানে।

একটু পরে স্টিভ এসে ফোন ধরে, হ্যালো, স্টিভ কথা বলছি।

—গুড মর্নিং অ্যাঙ্কেল। আমি রোজি, কথা বলছি।

—মর্নিং। কাল দু' তিনবার ফোন করেও তোমাদের বাড়ির লাইন পাইনি। কি ব্যাপার বলতো?

—আসলে কালকে আমাদের অনেক ফোন করতে হয়েছিল। সে সময় আপনি হয়তো ফোন করে থাকবেন।

একটু থেমে রোজি ফের বলে, অ্যাঙ্কেল, বাবার কোন খবর জানেন? বাবার ব্যাপারে আমরা বড় চিন্তায় আছি।

চিন্তায়? কি ব্যাপার বলতো? তোমার বাবা পরশুদিন আমার বাড়িতে এসেছিলেন।

—কাল বাবার সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

—না। তাছাড়া কাল আমি এখানে ছিলাম না।

ও, রোজির আশাহত গলা।

—কি হয়েছে বলতো?

—বাবা কাল দুপুরে সেই যে বেরিয়েছেন এখনো বাড়ি ফেরেননি। আমি কোথাও ফোন করতে বাকি রাখিনি।

—সে কি কথা!

—আচ্ছা। আর কাকে ফোন করা যায় বলুন তো?

—তুমি একবার মিসেস জোহানসনকে ফোন করতে পারো।

—আচ্ছা, আচ্ছা। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা।

—বলো, মিঃ স্টিভ জানতে চান।

—বাবা এর মধ্যে কোথাও যাবেন বলে আপনাকে কিছু বলেছেন?

—উঁহু। সে রকম কোন কথা হয়নি আমাদের মধ্যে। তোমার কথায় আমার তো খুব চিন্তা হচ্ছে।

—হ্যাঁ, আমরাও ভীষণ চিন্তায় আছি।

—স্বাভাবিক। তোমার বাবা ফিরে এলে আমায় জানিও। আর আমিও দুপুরে একবার ফোন করবোখন।

—আচ্ছা। মিসেস জোহানসনের ফোন নাম্বারটা আপনার জানা আছে।

—হ্যাঁ। তুমি ফোন ধরো। আমার ডায়েরীতে লেখা আছে। হ্যাঁ, উনি কোন খবর জানালেও জানতে পারেন। আমরা সবাই এক সঙ্গে মর্নিং ওয়ার্ক করি। হয়তো ওঁনাকে বলে থাকবেন। আমায় হয়তো ভুলে গেলেন কথাটা বলতে। তুমি ফোনটা ধরো। আমি এখুনি আসছি।

—ঠিক আছে।

ইতিমধ্যে সুশান কথা বলে। দিদি, আমার মনে হচ্ছে, বাবার খবর ভালো নয়। সাড্ডা বেজে গেল।

—ওকথা বলিস নারে।

—আমার কিন্তু ভালো লাগছে না। আমার ব্যাপার না হলে বাবাকে

এভাবে বের হতে হতো না। সুশানের চোখে জল এসে যায়। কথার শেষের দিকে তার গলা ধরে আসে।

রোজি সুশানের কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলে, হ্যাঁ, বলুন। তারপর সে ফোন নাম্বারটা লিখে নেয়। আপনাকে ধন্যবাদ। আমি এখুনি মিসেস জোহানসনকে ফোন করছি।

—কোন খবর থাকলে আমায় জানাবে, মিঃ স্টিভ বলে।

—নিশ্চয়ই, বলে রোজি রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।

রোজি রিসিভারটা নামিয়ে রাখার পর মেরি বলে, ম্যাডাম, কোন খবর আছে? তার চিন্তিত মুখ।

—না, রোজি মাথা নাড়ে।

—ম্যাডাম, এবার যে আমায় যেতে হয়। মিসেস হেনপ্রেভের ওখানে না গেলেই নয়।

—নিশ্চয়ই যাবে। তোমার এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।

—আমি এখন যাচ্ছি। দুপুরে সাহেবের খবর নিতে একবার আসবোখন। যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু বড্ড চিন্তা নিয়ে যাচ্ছি।

—তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি। তোমার এবাড়িতে কতদিন হয়ে গেল। বাড়ির প্রতি দয়া-মায়া থাকবে বই কি।

তারপর মেরি চলে যেতে রোজি আবার রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করতে থাকে। একবারেই লাইন পেয়ে যায়, কিন্তু কেউ ফোন ধরছে না। রিং হয়েই চলেছে।

রোজি কি করবে বুঝতে পারছে না। প্রায় মিনিট দুয়েক হতে চলেছে, ভাবে, আর মিনিট খানেক ধরে ফোন ছেড়ে দেবে। ঠিক তখনই অপর প্রান্তের গলা শোনা যায়, হ্যালো।

—অ্যান্টি, গুড মর্নিং। আমি রোজি কথা বলছি।

—মর্নিং! মর্নিং! সব ভালো তো?

—না অ্যান্টি। বাবা কাল দুপুরে বেরিয়েছেন এখনো ফেরেননি।

—সে কি! কিছু বলে যায় নি?

—না। তাই তো সারা জায়গায় বাবার ব্যাপারে ফোন করছি।

—এত বড় চিন্তার কথা।

—কাল সারা রাত আমরা ঘুমোতে পারিনি।

—না পারাই স্বাভাবিক।

—বাবা এর মধ্যে কোথাও যাবার কথা আপনাকে বলেছেন?

—বলেছে একবার রবিনসনের কাছে যাবে।

—হ্যাঁ, ভাইয়ের ওখানে যাবে তা আমাদের বলেছেন। তবে যাবার কথা আজ ছিল না, বলেছিলেন, দিন তিনেক পরে যাবেন।

—কি ভেবে কাল ওখানে চলে যায়নি তো?

—না আ্যান্টি। গতকাল সকালে সে রকম তো কিছু বলেন নি।

—ও।

—তাহলে তো বড় চিন্তার কথা হলো।

—না, না চিন্তার কিছু নেই, মিসেস জোহানসন স্তোকবাক্যে ওকে সান্ত্বনা দিতে চায়। দেখবে ঠিক চলে এসেছেন।

—আপনার কথাই যেন সত্যি হয়।

—হবে হবে। আমি একটু পরে তোমাদের বাড়ি যাবোখন।

—ঠিক আছে, রাখছি।

রোজি ফোনটা নামিয়ে রাখতে সুশান বলে, আর কোথায় ফোন করবি। করার তো কিছু বাকি রইলো না। নিশ্চয়ই বাবার কিছু একটা হয়েছে। আমার মন কু ডাকছে।

—তুই ওসব কথা বলে আমার মন আরো খারাপ করে দিস না। আমার এখন আর কিছু ভালো লাগছে না। বাবা না ফেরা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

—দাদাকে ফোন করবি?

—হ্যাঁ, রবিনসনকে ফোন করতে হবে ঠিকই। তবে এখুনি করতে চাই না। এত দূরে থাকে, করলে ওর পক্ষে আসতে খুবই অসুবিধে হবে। দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করে। তাছাড়া, ছুটিরও ব্যাপার আছে। এর মধ্যে বাবা ফিরে এলে ওকে আর ফোন করতে চাই না।

—বাবার ফিরে আসার আমি তো কোন সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছি না। আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে।

তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে সুশান বলে, দিদি, স্থানীয় থানায় একবার জানিয়ে রাখলে ভাল হয়।

—ওসব থানা-পুলিশের ব্যাপার করতে আমার রীতিমতন ভয় করে। যদি করতেও হয় তো রবিনসন এসে করবে।

ইতিমধ্যে টম জেগে গেছে। সে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে আসে। এক হাত দিয়ে চোখ ডলছে।

রোজি ঐভাবে ছেলেকে কাঁদতে দেখে ওর কাছে ছুটে যায়, টম, কাঁদছো কেন? কি হয়েছে?

টম চোখ মুছতে মুছতে বলে, আমি একটা খুব বাজে স্বপ্ন দেখেছি। কথা শেষ করে সে ফোঁপাতে থাকে।

—খুব বাজে স্বপ্ন ? রোজি ছেলেকে আদর করে বলে। তা স্বপ্নটা কি দেখেছো ?

—দেখেছি, আমার দাদা নেই। দাদাকে কারা যেন ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে।

—না, না, ওটা ঠিক নয়, রোজির বুক কেঁপে ওঠে। আসলে তুমি দাদুর কথা ভাবতে-ভাবতে শুয়ে পড়েছো বলে এমন স্বপ্ন দেখেছো। স্বপ্ন সত্যি হয় না।

—স্বপ্ন সত্যি হয় না ? টম মাকে জেরার ভঙ্গিতে কথাটা জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ হয় না। যাও, তুমি এখন বাথরুম থেকে ঘুরে এসো। টম বাধ্য ছেলের মত বাথরুমের দিকে পা বাড়াতে সুশান দিদির দিকে তাকায়। বলে, দেখ্, ওর মনের মধ্যে পর্যন্ত কু ডাকছে।

—না, না, ওসব কিছু নয়, রোজি এ কথা বলে মনকে বোঝাতে চাইছে। তবু কথাটা তেমন জোর দিয়ে বলতে পারলো না। তার মনেও কেমন যেন একটা সন্দেহ রয়ে গেছে।

—দিদি, ব্যাপারটা আমার ভালো মনে হচ্ছে না। তুই দাদার সঙ্গে যোগাযোগ কর। দাদা এলে তবু কিছুর একটা কিনারা হলেও হতে পারে। আমরা মেয়ে মানুষ কিই বা করতে পারি!

—তোর কথাটা ফেলনা নয়। রবিনসনকে ফোন করলেই বোধ হয় সবচেয়ে ভালো হবে।

—এখন ও আর বোধহয় অ্যাপার্টমেণ্টে নেই, বলে সুশান দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায়। প্রায় আটটা বাজতে চলেছে। ওকে অফিসে ফোন করতে হবে।

—ডায়রীটা নিয়ে আয়। ওতে রবিনসনের ফোন নাম্বার লেখা আছে, বলে রোজি সুশানের দিকে তাকায়।

—আনছি, বলে সুশান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

ওদিকে একটু পরে টম বাথরুম থেকে ফিরে এসেছে। তার মুখখানা এখনো স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। থমথমে হয়ে আছে।

এরপর সুশান ডায়রী নিয়ে ফিরে আসতে রোজি বলে, তুই আর টম ব্রেক ফাস্ট করে নে। আমি একটু পরে খাচ্ছি।

—দিদি, আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।

—ও কথা বলিস না। টমকে নিয়ে খা।

—আমি তোর সঙ্গে খাবো।

—তবে টমকে দে। আমি ততক্ষণে ফোনটা করে নিই।

ফোনটা এক নাগাড়ে বেজে চলেছে। জুলিয়ান অকাতরে ঘুমিয়ে চলেছে গতকাল অনেক রাতে পার্টি থেকে ফিরেছে। তা কম করে দুটো হবে।

অ্যাপার্টমেন্টে জুলিয়ান একাই থাকে। ফলে অন্য কেউ ফোন ধরতে পারছে না। ফোনটা বেজেই চলেছে।

এখন প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। জুলিয়ান গতকাল রাতে শুতে যাবার আগে মোটামুটি ঠিক করে রেখেছে যে, দশটা নাগাদ উঠবে। উঠে লাঞ্চ করে ফিগারেটে যাবে। তারপর ওখান থেকে তার বিজনেস সেণ্টারে। ওখানে মডেলিং-এর কাজ করে। ওর বাজার ভালো। মডেলিং-এ ইতিমধ্যেই বেশ নাম করেছে। টি. ভি., সিনেমা, নানা ধরনের পত্র-পত্রিকায় ওর প্রায়ই বিজ্ঞাপন থাকে। চটকদার সে সব বিজ্ঞাপন।

ফোনের আওয়াজে এবার জুলিয়ানের ঘুম ভেঙে যায়। বিরক্তির সাথে বিছানার সঙ্গে লাগানো টেবিলের উপর থেকে রিসিভারটা তুলে নেয়, হ্যালো।

—গুড মর্নিং জুলিয়ান। আমি রবিনসন। তোমার সুন্দর ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম তো!

—হ্যাঁ, তুমি ভীষণ অন্যায় করেছো। শুতে শুতে কাল রাত দুটো হয়ে গেছে।

—তুমি না বলেছিলে দশটায় বেরুবে।

—হ্যাঁ। তার ঢের দেরি আছে।

—মোটেই নেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখো কটা বাজে।

—তুমি আমায় ডেকে ভালোই করেছো। প্রায় দশটা বাজতে চলেছে। থ্যাংক ইউ। তুমি তো অফিস থেকে ফোন করছো, তাই না?

—হ্যাঁ। রাতে অ্যাপার্টমেন্টে আসছো তো?

—আসবো, তুমি তো আবার বোনের বিয়ের জন্য ছুটি নিয়ে দিন তিনেক পরে চলে যাচ্ছো।

—তোমায় ছেড়ে চলে যেতে আমার একেবারে মন চাইছে না, কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই।

—তা আমি জানি।

—তুমি রাগ করছো না তো?

—উহুঁ। তবে আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা একটু এগিয়ে রেখো। তোমার ড্যাডির সঙ্গে একটু কথা বলে এসো।

—বাবাকে তোমার কথা অনেক আগেই বলেছি।

—তা তোমার ড্যাডি কি বলেছেন?

—তার অমত নেই।

—এ কথাতো তুমি আমায় বলোনি।

—তোমায় একবারে সার প্রাইজ দেবো বলে বলিনি। এবার খুশী তো ?

—উহুঁ, জুলিয়ান কপট রাগ দেখায়। তুমি আমায় এতদিন বলোনি বলে আমি রাগ করেছি। তাই তোমার বোনের বিয়েতে আমি আর যাচ্ছি না। এ কথা তোমায় আমি আগেই বলে রাখছি কিন্তু।

—ওটা তোমার মনের কথা নয় তা আমি বেশ ভালো করেই জানি। রবিনসন তার কথায় জোর দিয়ে বলে।

—কি করে তুমি জানলে ?

—তোমার সঙ্গে আমি কি কমদিন মিশছি! তোমার স্বভাব চরিত্র বেশী জানা না হলেও কিছু অন্তত জানা হয়ে গেছে।

—তোমার বাবা আমাদের ব্যাপারটা সহজে মেনে নেবেন তা ঠিক ভাবতে পারিনি। তাই মনে আমার একটু সন্দেহ ছিল।

—আমার মনে কিন্তু কোন সন্দেহ ছিল না। বাবা একটু পুরনো পন্থি মানুষ ঠিক, তবে একমাত্র ছেলের কথা ঠেলবে না কিন্তু তা আমি বেশ ভালো করেই জানতাম, আর আমরা তো কোন অন্যায় করিনি! তাছাড়া, তোমাদের আমাদের পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতাও আছে। সুতরাং আপত্তি তুলবার কোন কথাই উঠে না। যাক্, ফোন ছাড়ছি, তুমি তৈরি হয়ে নাও।

—তা নয় নিচ্ছি। তুমি কবে বাড়ি যাবে ?

—আমি দিন তিনেক পরে যাবো।

—আমি কিন্তু বিয়ের দিন সকালে যাবো।

—তাহলেই হবে। মোট কথা তোমার যাওয়া চাই কিন্তু। আগে ভাগে এদিকের কাজ-কর্ম সেরে রাখো। পরে কোন রকম অজুহাত শুনতে রাজি নই।

—যাবার ইচ্ছে তো ষোলো আনাই আছে, যদি না সেরকম কোন ঝামেলায় আটকে যাই।

—ও সব কোন কথা শুনতে রাজি নই। রাতে অ্যাপার্টমেণ্টে এসো তখন কথা হবে।

—ঠিক আছে, ছাড়ছি।

রোজি ফোন নাম্বারটার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুশানের দিকে তাকায়, ভাইয়ের ফোন ঠিক টুকে এনেছিস তো ?

—হ্যাঁ, লিখে একবার মিলিয়ে নিয়েছি।

—রোজি রিসিভার তুলে ডায়াল করতে থাকে, এনগেজ। আবার ট্রাই করে এবারও এনগেজ। মনে মনে ভাবে, এতো মহা মুশকিল হলো। তবে এ কথাও ঠিক, অফিসের ফোন এত সহজে পাওয়া যায় না। ভাইও তাকে সে কথা

বহুবার বলেছে। বড্ড বিজি থাকে। সন্ধ্যের দিকে হলে তবু লাইন পাবার চান্স থাকে। রোজি তবু হাল ছাড়ে না। আবার ট্রাই করে যায়, কারণ রবিনসনকে পাওয়া তার এখন ভীষণ দরকার। তার বাবা এখনো বাড়ি ফেরেনি। যত দেরি হচ্ছে তত তার চিন্তা বাড়ছে।

এবার রোজি রবিনসনের অফিসে ফোন না করে এক্সচেইঞ্জে ফোন করে। সেখানের লাইন একবার ডায়াল করতেই পেয়ে যায়, ওখানে রিং হচ্ছে। নিশ্চয়ই কেউ ধরবে।

—হ্যালো, একটি মেয়ের গলা ভেসে আসে।

রোজি রবিনসনের ফোন নাম্বার জানিয়ে বলে, লাইনটা ঠিক আছে কিনা দেখবেন। আমি বহুবার ট্রাই করেও লাইন পাচ্ছি না। বার বার এনগেজ টোন পাচ্ছি। নয়তো একটা কড় কড় শব্দ করে লাইনটা ডেড হয়ে যাচ্ছে।

—ঠিক আছে, আমি দেখছি।

একটু পরে টেলিফোন অপারেটার মেয়েটি জানায়, না লাইন ঠিক আছে। আপনি ট্রাই করুন। পেয়ে যাবেন। আমার বোর্ডে অন্য লাইন এসেছে। বলে লাইনটা ছেড়ে দেয়।

রোজি মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ পেলনা। তারপর সে ডায়াল করতে থাকে। সত্যি, সে রবিনসনের লাইন পেয়ে যায়।

মেয়ে অপারেটারের গলা ভেসে আসে। হ্যালো, গুড মর্নিং।

—গুড মর্নিং। বলে রোজি রবিনসনের ফোন নাম্বারটা বলে।

—হ্যাঁ। আপনি ঠিক নাম্বারেই ফোন করেছেন।

—আমায় একটু অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেণ্টে দেবেন।

—ধরুন। আমি লাইন ট্রান্সফার করে দিচ্ছি।

—ধন্যবাদ! রোজি ফোন ধরে থাকে।

একটু পরে একজন পুরুষের গলা শোনা যায়, আমায় একটু রবিনসন গোমস্‌কে দেবেন।

—আপনি কে কথা বলছেন?

—বলুন ওর দিদি কথা বলছি।

—আপনি ধরুন। আমি খবর পাঠাচ্ছি।

—ধন্যবাদ! রোজি লোকটিকে সাধুবাদ জানালো। বলবেন, খুব জরুরী ব্যাপারে ওকে ফোন করছি।

—ঠিক আছে। আমি ইণ্টারকামে ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি। একটু ফ্যাক্টরিতে রাউণ্ডে গেছে।

—আচ্ছা, আচ্ছা। আমি ধরছি।

রোজি মিনিট কয়েক অপেক্ষা করার পর রবিনসনের গলার স্বর পায়, হ্যালো

রবিনসন কথা বলছি।

—আমি দিদি বলছি।

—হ্যাঁ, ইন্টার কামে সে কথা আমায় বলেছে।, তা হঠাৎ ফোন কি ব্যাপারে। সব খবর ভালো তো?

—এদিকের খবর মোটেই ভালো নয়।

—কেন? কি হয়েছে? রবিনসন জানতে চায়।

—বাবা কাল বারোটা নাগাদ বেরিয়েছে, কিন্তু এখনো বাড়ি ফেরেনি, রোজি জানায়। তুই চিন্তা করবি, তাই হট করে তোকে কোন ফোন করতে চাইনি।

—সে কি! রবিনসন বিস্মিত।

—তাই তোকে ফোন করলাম।

—কোথায় গেছে?

—বিয়ের ব্যাপারে এবং ঘরের জন্যও টাকা তোলার দরকার ছিল। ব্যাংকে যাবে বছেলে।

—ব্যাংকে গেলে তো এত দেরি হবার কথা নয়।

—আমরাও তো সেই ভেবে আরো চিন্তিত হয়ে পড়ছি।

—হ্যাঁ। চিন্তা হবারই কথা। অন্য কোথাও যায়নি তো।

—না, সে রকম আমাদের তো কিছু বলে যায়নি।

—বাড়ির গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল?

—না। রোজি একটু আমতা আমতা করে বলে।

—কেন? রবিনসন কারণ জনতে চায়।

—গাড়িটা নিয়ে আমরা একটু বেরিয়েছিলাম। এত যে ফিরতে দেরি হবে তা ভাবতে পারিনি।

—তোরা এক-একটা যা কাণ্ড করিস না!

রোজি ভাইকে সে কথা না বললেও মনে মনে স্বীকার করে, গাড়িটা এতক্ষণ আটকে রাখা তাদের মোটেই উচিত হয়নি। হয়তো গাড়িটা না পাওয়ার জন্যই বাবা এ বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। দিনকাল মোটেই ভালো নয়।

—'জুলিয়ান মেরী' হাসপাতালে খোঁজ করেছিস?

—ওখানে তো করেছিই। তাছাড়া, একটু দূরের তিন চারটে হাসপাতালে খোঁজ করেছি। কোন খবর নেই।

—স্থানীয় থানায় জানিয়েছিস?

—থানা-পুলিশের ব্যাপার বড্ড ভয় করে। তুই এসে যা করার কর। পুলিশের নাম শুনলেই আমার গা কাঁপে।

—আমি এখন কি করে আসবো?

—তুই না এলে হবে না।

—একে সুশানের বিয়ের জন্য ছুটি নিয়েছি। তার উপর এখন আগে যাই কি করে!

—তুই একটু উপরওয়ালাকে বাবার কথা বলে ম্যানেজ করার চেষ্টা কর। এর চেয়ে বিপদ আর মানুষের কি হতে পারে। রোজি তার কথায় বেশ জোর দিয়ে বলে।

—দেখি বলে। ছুটি পাবো কিনা সন্দেহ আছে।

—ভালো করে বুঝিয়ে বলবি।

—সে তো বলবোই।

—আমি লাইন ধরে আছি।

—না, তুই লাইন ছেড়ে দে। কতক্ষণ ধরে থাকবি কিন্তু তোর আসা চাই।

—ঠিক আছে ছাড়ছি।

রবিনসন বড় সাহেবের চেম্বারের সামনে এসে দাঁড়ায়। নক করে ঢুকতে ঠিক সাহসে কুলচ্ছে না। গেলেই তো বলবে, তুমি তো বোনের বিয়ের জন্য ছুটি নিয়েছো। আবার তার আগে ছুটির কথা বললে কি করে চলে।

—চেম্বারের সামনে রবিনসন দাঁড়িয়ে আছে। এক পা এগোয় তো যেন দশ পা পেছোয়। আসলে ঠিক ভরসা পাচ্ছে না। তার উপর রাশভারি মানুষ। তবে ব্যবহার মন্দ নয়।

কিন্তু রবিনসন এভাবেই বা কতক্ষণ চেম্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে! এটা ঠিক শোভন নয়। কেউ দেখলেই বা তার কি জবাব দেবে! তবু তার অস্বস্তি দূর হয় না।

রবিনসন কিছুটা ইতস্তত করে চেম্বারে নক করে ভেতরে ঢোকে। তার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। নিশ্বাসের শব্দ সে যেন শুনতে পাচ্ছে। তার বুক কেঁপে উঠছে।

মিঃ ফার্গুসন একটা ফাইলের মাঝে ডুবে আছেন। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। মাথায় প্রায় ছ' ফুটের কাছে লম্বা হবে। সেই রকম স্বাস্থ্য। তবে মাথায় টাক পড়েছে। ফলে কপালটা অসম্ভব রকম বড় দেখাচ্ছে।

মিঃ ফার্গুসন রবিনসনের দিকে তাকাল না। না তাকালেও ইঙ্গিতে সামনের গদী মোড়া চেয়ারে রবিনসনকে বসবার জন্য ইঙ্গিত করেন।

— থ্যাংক ইউ স্যার, বলে রবিনসন এক রকম বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে বসে। একটা অসম্ভব রকম আস্বস্তি সে বোধ করতে থাকে। ইদানীং এ রকম পরিস্থিতিতে পড়েছে কিনা সন্দেহ।

মিনিট খানেক পরে ফাইলের উপর থেকে মুখ তুলে ফার্গুসন রবিনসনের

দিকে তাকান, বলো, তোমার কি স্যার।

—স্যার, আমার বাবাকে গতকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, রবিনসন কাচুমাচু মুখ করে জানায়।

—সে কি! ফার্গুসনের মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে ওঠে। নানা জায়গায় খোঁজ খবর করেছো?

—হ্যাঁ স্যার। ওরা ঠিক ভরসা পাচ্ছে না বলে আমায় ফোনে বারবার করে যেতে বলেছে, আর কয়েকদিন পরেই আমার বোনের বিয়ে। কি যে করবো আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

—তুমি এখন কি করতে চাও।

—স্যার, আমার ছুটিটা আজ থেকে করে দিতে পারলে ভালো হয়।

—আমি তোমার ব্যাপারটা ফিল করছি।

—থ্যাংক ইউ স্যার।

—আচ্ছা, তুমি একটু দাঁড়াও। বলে ফার্গুসন ইন্টার-কাম ফোনে রিসিভার তুলে ডায়াল করতে থাকে।

অপর পক্ষ রিসিভার তোলে, হ্যালো ফার্গুসন হিয়ার।

—বলুন স্যার।

—আমায় ম্যাথুজকে দেখি।

—আমি ডেকে দিচ্ছি।

ফার্গুসন আবার ফাইলের মাঝে ডুবে যান। রিসিভারটা চেয়ার ছেড়ে উঠে সৌজন্যতার খাতিরে রবিনসন ধরে আছে।

অপর পক্ষ সাড়া দেবার সঙ্গে সঙ্গে রবিনসন লাইনটা ফার্গুসনকে দেয়। স্যার, কথা বলুন।

—হ্যালো, ম্যাথুজ?

—ইয়েস স্যার, ম্যাথুজ একটু চিন্তিত।

—তুমি একবার আমার চেম্বারে এসো।

—এখুনি আসছি স্যার।

রবিনসন জানতো, স্যার এরকম একটা ব্যবস্থা করবে। নইলে তার ছুটি মঞ্জুর হবে না। ম্যাথুজ নিশ্চয়ই রাজি হবে। কারণ সে উপরের পোস্টে প্রমোসন পেয়ে চলে গেলে সেখানে ওরই যাবার কথা। তাই ও এখন নিশ্চয়ই বেগড়বাই করবে না। আর তা করা মানে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ল মারা। তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস ও ছেলে ভালো। রাজিও হবে এবং তার ছুটিও মিলবে।

একটু পরে ম্যাথুজ এলো। বয়স রবিনসনের চেয়ে দু' এক বছরের ছোটই হবে। একটু রোগা ধরনের চেহারা। মাথায় প্রায় পাঁচ ফুট সাত আট

ইঞ্চি লম্বা হবে। পরনে দামী পোশাক। পায়ে চকচকে স্যু। হাতে ঘড়ি।

ফার্গুসন ম্যাথুজকে বসতে বলে রবিনসনের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে। তারপর ওকে রবিনসনের কাজের ভারটা নিতে অনুরোধ করে। আশা করি তুমি আমার কথা রাখবে।

—নিশ্চয়ই স্যার, ম্যাথুজ সায় জানায়।

—তোমার ও রবিনসনের কাজের মধ্যে সেগুলো বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেগুলো আগে করবে। বাকিগুলো পরে করলেও চলবে, আর ক'দিন পরেই তো রবিনসন চলে আসবে।

—ঠিক আছে স্যার, হেনরী ম্যাথুজ মাথা নাড়ে। কোন অসুবিধে হবে না।

এবার ফার্গুসন রবিনসনের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি একটা ছুটির ফর্ম ফিল-আপ করো। আমি সই করে দিচ্ছি।

—আমি এখুনি ফিল-আপ করে নিয়ে আসছি।

—আর তুমি ম্যাথুজকে তোমার কাজের ব্যাপারে...... ।

—ঠিক আছে, রবিনসন মাথা নেড়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে। ম্যাথুজও রবিনসনকে অনুসরণ করে চেম্বারের বাইরে পা রাখে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় রবিনসন টেলিফোন অপারেটার হেলেনের কাছে গিয়ে বলে, হেলেন, আজ বিকেলে নিশ্চয়ই তুমি ব্যস্ত আছো ?

হেলেন মিষ্টি হেসে জবাব দেয়, তা তুমি কি করে বুঝলে ?

—তোমার সাজ-পোশাক অন্যদিনের তুলনায় আজ একটু অন্য ধরনের। রবিনসন ও কথা বলে হেলেনকে খুশী করতে চায়। আর হট করেই বা কাজের কথা বলা যায়।

—ভালো লাগছে ? হেলেন জানতে চায়।

—তুমি দেখতে এমনিতেই সুন্দর। তার উপর আজ তোমায় দারুণ লাগছে। যদিও এ ধরনের কথা বলতে রবিনসনের আদৌ ইচ্ছে করছে না। অথচ বলতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ তাদের বাড়ির লাইন একটুতেও ডেড হয়ে যায়। জোরে বৃষ্টি পড়লে তো আর কথাই নেই।

—রিয়েলি ? হেলেন যাচাই করে নিতে চায়।

—রিয়েলী, রবিনসন অল্প হাসে এবার তোমার আমায় একটা কাজ করে দিতে হবে।

—বলো। তোমার কি কাজ করতে হবে ?

—তোমার বাড়ির লাইন। উঃ, বাঃ।

—তুমি ট্রাই করে দেখো। তারপর আমার লাক। বলে রবিনসন তার বাড়ির ফোন নাম্বারটা জানায়।

— তুমি সেকশনে চলে যাও। আমি ট্রাই করে যাচ্ছি।

—থ্যাঙ্ক ইউ। রবিনসন টেলিফোন বোর্ডের কাছ থেকে একটু দ্রুত হেঁটে নিজের চেয়ারের কাছে ফিরে এসে হাত ইশারা করে ম্যাথুজকে ডাকে।

ম্যাথুজ রবিনসনের সীটে ফেরার অপেক্ষায় ছিল। তাই রবিনসন ইশারা করা মাত্রই চেয়ার পিছনে ঠেলে ওর কাছে চলে আসে।

রবিনসন ওর সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বলে, ম্যাথুজ তোমায় এ কাজের ব্যাপারে কিছুইতো বলার নেই। আগে তুমি তো আমাদের সেকশনেই ছিলে।

—হ্যাঁ। কোন অসুবিধে হবে না। দাঁড়াও, তবু একটু দেখে নিই। বলে ম্যাথুজ কাগজ-পত্তরের উপর চোখ বোলাতে থাকে।

ইতিমধ্যে রবিনসন অ্যাপ্লিকেসন ফর্ম ফিল-আপ করে ফার্গুসনকে দিয়ে সই করার জন্য তৈরি হয়। সে শুধু বাড়ির ফোনটার জন্য অপেক্ষা করছে। ওখানের খবর যদি ভালো হয় তাহলে এখন আর সে বাড়ি যাবে না। দূরে কাজ করার এই এক ঝামেলা। হঠাৎ জুলিয়ানের কথা মনে পড়ে, ওর আজ সন্ধ্যায় তার অ্যাপার্টমেণ্টে আসার কথা। যদি যেতে হবে তাহলে ওকে জানিয়ে যেতে হবে। নইলে ও ভীষণ চিন্তা করবে, তাছাড়া সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, তাকে নানা রকম ঝামেলায় পড়তে হবে। থানা-পুলিশ হাসপাতাল মানে সাংঘাতিক ব্যাপার। এ ব্যাপারে ওর সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। ওর কোন এক আত্মীয় নাকি পুলিশে আছে। হঠাৎ একদিন কথায় কথায় ও বলেছিল। কাজে লাগুক আর নাই লাগুক তার নামটা জেনে নেওয়া দরকার। একটা রেফারেন্স থাকা ভালো। কখন কোন কাজে লাগে তা কে বলতে পারে।

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠতে রবিনসন এক রকম ছুটে গিয়ে ফোনটা ধরে। হ্যালো। সে বেশ চিন্তিত।

অন্যপ্রান্ত থেকে হেলেন হেসে বলে, বার কয়েক ট্রাই করার পরই লাইন পেয়ে গেছি। স্পিক হিয়ার।

—থ্যাঙ্ক ইউ। হ্যালো। আমি রবিনসন কথা বলছি।

—আমি সুশান কথা বলছি।

—বাবা ফিরেছে? রবিনসন কিছুটা উত্তেজিত।

—না দাদা। সুশানের নির্জীব গলা।

—কোন খবর আছে?

—উহুঁ, সুশান অসহায়ভাবে মাথা নাড়ে।

—ঠিক আছে, আমি একটু পরেই রওনা দিচ্ছি, তবু রবিনসন গজরাতে ছাড়ে না। যতসব ঝামেলা।

—আমরা কিন্তু তোর পথ চেয়েই আছি।

—বিকেলের মধ্যেই পৌঁছে যাবো।

—জানি, তোর খুবই অসুবিধে হচ্ছে। কি আর করা যাবে বল।

—আর অসুবিধে! তা দিদি কি করছে?

—এই মাত্র বাথরুমে গেল।

—তাহলে আর ওকে দিতে হবে না। টম কি করছে?

—এই তো একটু আগে ঘুম থেকে উঠে 'দাদু! দাদু'! করছে।

বাবা আবার ওকে বলেছে যে, আসার সময় টয় ট্রেন নিয়ে আসবে। পাচ্ছে না বলে ওর মন আরো খারাপ।

—ওকে বলিস আমি নিয়ে আসছি। ছাড়ছি।

—ঠিক আছে। তুই যত তাড়াতাড়ি পারিস্ বেরিয়ে পড়।

—হ্যাঁ, একটু পরেই রওনা দিচ্ছি।

রবিনসন রিসিভার নামিয়ে রেখে অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে ফাগুসনের চেম্বারে হাজির হয় এবং তাকে দিয়ে সই করিয়ে ফের হেলেনের কাছে উপস্থিত হয়।

হেলেন ফোনে কথা বলছে। ইশারায় রবিনসনকে দাঁড়াতে বলে কথা বলার ফাঁকে একটা লাইন রিসিভ করে তাড়াতাড়ি কথা সেরে নিয়ে ওর দিকে তাকায়।

—লাইন পেয়েছি, রবিনসন বলে। এবার জুলিয়ানের সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার।

—কেন? কেন? হেলেনের চোখে মুখে দুষ্টুমি।

—জরুরী কাজে আমি এখুনি বাড়ি চলে যাচ্ছি। ফিরতে প্রায় দিন সাতেক লেগে যাবে।

—হ্যাঁ, তোমার বোনের বিয়ের কথা বলছিলে।

—আরো অনেক ব্যাপার আছে বলে রবিনসন জুলিয়ানকে ফোন নাম্বার দেয়। দিয়েই ভাবে ওকে এখন পাওয়া যাবে কি না তা কে জানে। কাজে কোথাও বেরুতে পারে। না পেলেই হয়েছে। ওকে জানিয়ে যাওয়া খুবই দরকার। নইলেও ভীষণভাবে চিন্তা করবে।

এরপর সীটে ফিরে এসে রবিনসন ম্যাথুজের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কাজের ব্যাপারে কথাবার্তা সেরে নেয়। তারপর ম্যাথুজ চলে যেতে হাত ঘড়ির দিকে তাকায়। প্রায় সাড়ে দশটা বাজতে চলেছে। ভাবে, এবার যাবার জন্য তৈরি হতে হয়। তবে তার আগে জুলিয়ানের সঙ্গে কথা বলা দরকার এবং কোঅপারেটিভ থেকে কিছু টাকাও নিয়ে যাওয়া খুবই প্রয়োজন। বিয়ের ব্যাপার তো আছেই তাছাড়া নতুন এক ঝামেলার সৃষ্টি হলো।

রবিনসনের নিজের উপরই বিরক্তি ধরে যায়। উঃ, সকালে যে কার মুখ দেখে উঠেছিল! ভেবেছিল, ছুটিটা চুটিয়ে উপভোগ করবে। তার উপরে জুলিয়ানের থাকার কথা। একবার নিয়ে যেতে পারলে ওকে যেন-তেন প্রকারে

ঠিক আটবে দেবে।

ইতিমধ্যে টেলিফোনটা বেজে উঠতে রবিনসন একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে রিসিভারটা তুলে নেয়, হ্যালো।

হেলেন এক গাল হেসে বলে, তোমার প্রেমিকাকে অনেক কষ্টে পাকড়াও করতে পেরেছি। নাও, কথা বলো।

—থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ! হেলেন, ইউ আর রিয়েলি গ্রেট! তুমি অত ভালো কেন বলতো?

—এ কথা তোমার প্রেমিকা শুনলে রেগে যাবে। নাউ স্পিক হিয়ারে। ও তোমার জন্য ওয়েট করছে।

—হ্যালো, জুলিয়ান? আমি রবিনসন।

—হ্যাঁ, জুলিয়ানের অসহিষ্ণু গলা। আবার কি হলো!

—ভীষণ বিপদে পড়েছি।

—ভীষণ বিপদ? তোমার? কই, সকালে ফোন করার সময় সে কথা তো বলোনি?

—এই তো অফিসে এসে জানতে পারলাম।

—তোমাকে কেউ ফোন করেছিল?

—হ্যাঁ, দিদি ফোন করেছিল।

—কি বললো?

—আমার বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, মিসিং।

—সে কি? জুলিয়ান অবাক হয়।

—তবে আর বলছি কি! বসের কাছ থেকে ছুটি পর্যন্ত নিতে হলো। আমাকে এখুনি বাড়ি যেতে হবে।

—এ অবস্থায় এছাড়া তো কোন উপায় নেই দেখছি।

—তুমি রাগ করলে না তো!

—না, না, এতে রাগের কি আছে!

—আচ্ছা জুলিয়ান, তোমার কোন এক আত্মীয় পুলিশে কাজ করে বলেছিলে না?

—হ্যাঁ, আমাদের এক আত্মীয়, কিন্তু সে তো এখান থেকে অনেক দূরে থাকে। তার রেফারেন্স যদি চলে তাহলে আমি তোমায় বলতে পারি। আমার কোন আপত্তি নেই।

—বলো। বলা যায় না। কখন কোনটা কিভাবে কাজে লেগে যায়। বলে রবিনসন ডট পেন আর এক টুকরো কাগজ বার করে। এটা সে হাতে করে নিয়েই এসেছিল। তুমি তার নাম ঠিকানা বলো, আমি লিখে নিচ্ছি।

—হ্যাঁ লেখো—

মিঃ অ্যালবার্ট রস।

উড স্ট্রিট থানা।

ওয়েলস্।

রবিনসন মিঃ রসের ঠিকানা লিখে নিয়ে বলে, ওয়েলস্ তো এখান থেকে অনেক দূর।

—হ্যাঁ, তা কম করে পাঁচশো মাইল হবে।

—থাক্ লেখা থাক্। যাক্, শোন, আমি রওনা দিচ্ছি।

—হ্যাঁ যাও। আমি তোমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবো।

—ঠিক আছে, আর বিয়ের ব্যাপারে যেতে যেন ভুলবে না। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো।

—না, না। ভুল হবে না, আর তোমার বাবার ব্যাপারটার জন্য চিন্তা করো না। দেখবে হয়তো বাড়ি এসে গেছে।

—তাই হয় যেন, নইলে বিরাট ঝামেলায় পড়তে হবে। ঠিক আছে, ছাড়ছি।

—হ্যাঁ, সাবধানে যেও।

রবিসন সায় জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে টেবিলে ফিরে এসে টেবিল গুছিয়ে কোয়াপারেটিভের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। কোয়াপারেটিভের সেক্রেটারী মিঃ টমসন রবিনসনের বিশেষ পরিচিত। অবশ্য যখন কোয়াপারেটিভ স্থাপিত হয় তখন ওর সঙ্গে রবিনসনের একবারে আলাপ ছিল না। অনেকে যখন ওখানে অ্যাকাউন্ট করতে চায়নি তখন ওই এগিয়ে গিয়ে অ্যাকাউন্ট করেছিল। তখন টমসন ওর হাত করমর্দন করে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছিল এবং অনুরোধ করেছে তার এ অফিসের পরিচিত কয়েকজন বন্ধু বান্ধব এখানে অ্যাকাউন্ট করে তো খুব ভালো হয়। ওর কথার মধ্যে কি একটা আবেগ ছিল তা রবিনসনের জানা ছিল না। পরবর্তীকালে সেই আবেগে ও ধরা দিয়ে অনেকের অ্যাকাউন্ট ও উদযোগী হয়ে ওখানে করিয়ে দিয়েছে। তার পরদিন থেকে টমসন ওকে অন্য চোখে দেখে। সে অকৃতজ্ঞ নয়, পরে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। লোন একবার চাইলেই হলো। সঙ্গে সঙ্গে তা দেবার ব্যবস্থা করেছে। আবার সাথে সাথে না দিতে পারলেও ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে এবং সপ্তাহ ফুরতে না ফুরতেই লোনের টাকা এসে সেকশানে দিয়ে গেছে। তাছাড়া, ওর ওখানে গেলে কফি, সিগারেট না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না এবং এখনো কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই বলে, তোমার মত কয়েকজনের সাহায্য না পেলে আজ কোয়াপারেটিভ এত বড় হতো না। এই কোয়াপারেটিভের দাঁড়ানোর পিছনে তোমার অবদান যথেষ্ট। তাই তোমার ঋণ কখনো ভুলবো না। সেই থেকে তুমি আমার একবারে কাছের মানুষ হয়ে উঠেছো। এবং কোন ব্যাপারে তোমার কাজে লাগতে পারলে আমার নিজেকে ধন্য মনে হয়।

রবিনসন এই আশাই নিয়ে কোয়াপারেটিভের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, একান্ত নিরুপায় না হলে টমসন তাকে কিছুতেই ফেরাবে না। সে বিশ্বাস তার আছে।

রবিনসন একটা সিগারেট ধরাবে ভাবছিল। না, সিগারেট আর ধরায় না। ধরাবার মত তার এখন মানসিকতাও নেই। মনটা কেমন যেন তেত হয়ে আছে।

রবিনসন আকাশের দিকে তাকায়। আকাশের আনাচে কানাচে মেঘের জটলা। সকালের দিকে হাল্কা ধরণের এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তারপর যখন পরিস্কার হওয়া দরকার ছিল তা আদৌ হয়নি, উল্টে আরো মেঘ জমতে শুরু করে দিয়েছে। যে কোন সময়ে তেড়ে বৃষ্টি নামতে পারে। হাওয়ায়ও একটা ঠাণ্ডা ভাব।

মেঘ দেখে রবিনসন থমকে দাঁড়ায়। তার ভুল হয়ে গেছে, ছাতা না নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছে। অন্যদিন সে অফিস যাবার সময় বর্ষাতি তো সঙ্গে নেয়ই এবং ছাতা নিতেও ভোলে না। এটাই ইউরোপীয় দেশের বলতে গেলে একটা অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার জন্য লোকে বলে, ইউরোপীয়-দের চিনতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। যার হাতে বর্ষাতি এবং ছাতা দেখবে, সেই হবে ঐ অঞ্চলের মানুষ। এটা একটা প্রবাদ বাক্যের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এখানে কখন যে বৃষ্টি নামবে না এবং কতক্ষণ আকাশ মেঘহীন থাকবে তা বলা বড় মুশকিল, তাই মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য ঐ দুটো জিনিস সঙ্গে নিতে বড় একটা ভুল করে না। করলে অনেক সময় এর জন্য চড়া মাশুলও দিতে হয়।

যাকু, রবিনসনের স্পষ্ট মনে আছে, সে অফিস যাবার সময় বর্ষাতি সঙ্গে না নিতেই ছাতা নিয়ে বেরিয়ে ছিল, তার একটা কালোরঙের ছোট্ট সুন্দর ফোল্ডিং ছাতা আছে। রবিনসন চলে যাবার পর ফার্গুসনের নির্দেশে ম্যাথুজ ওর কাজে লেগে গেছে। নিজের কাজ রেখে ওর দরকারী কাজে ইতিমধ্যে হাত লাগিয়েছে।

অফিসে পা দিয়ে রবিনসন তা দেখে খুশী হয়। সে এটা ম্যাথুজের কাছে আশাও করেছিল, অবশ্য ও এতে খানিকটা উৎসাহী হয়ে নিজের তাগিদেই করে চলেছে। পরবর্তীকালে এখানে সে কাজ করেছে, এটা সে জোরের সঙ্গে বলতে পারবে। রবিনসন সেকশনে হাজির হতে ম্যাথুজ ওর দিকে তাকায়, কি ব্যাপার তুমি গিয়ে আবার চলে এলে ? নিশ্চয়ই কিছু নিতে ভুলে গেছো।

—হ্যাঁ ছাতাটা নেওয়া হয়নি, বলে রবিনসন ড্রয়ার খুলে তার ছাতাটা বার করে।

তারপর রবিনসন ড্রয়ারটা বন্ধ করতে যাবে তখন হোয়াট নটের দিকে দৃষ্টি যায়। হোয়াট নটটা খোলা, হুইস্কীর বোতলে তখনো কিছুটা মদ আছে। আধবোতল না হলেও কিছুটা কম। রবিনসন হোয়াট নট থেকে মদের বোতল বার

করে মদটাই ঢক ঢক করে খানিকটা গলায় ঢেলে দেয়। তাতে তার মুখ খানিকটা কুঁচকে ওঠে। উঠলেও নিজেকে সে বেশ খানিকটা চাঙ্গাবোধ করে। নইলে কুলওভারে ঠিক ঠাণ্ডা আসছে না। কোটটা যদিও হাতে রয়েছে, পরেনি, পরলে বড় বোঝা মনে হয়। তবে যেভাবে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে চলেছে তাতে পরলে বেশ আরামই তার বোধ হবে। অস্বস্তি লাগবে না।

হুইস্কীর বোতলটা হোয়াট নটে রাখতে রাখতে রবিনসন ম্যাথুজের দিকে তাকিয়ে বলে, ওটা তুমিই শেষ করো। এরকম বোতল অনেকের হোয়াট নটে আছে। শীতপ্রধান দেশে এরকম মদের বোতল না রেখে উপায় নেই। অফিসেও এটা একটা অলিখিত নিয়ম হিসেবে চালু হয়ে আছে।

ম্যাথুজ কাজের ফাঁকে রবিনসনের দিকে তাকিয়ে বলে, থ্যাংক ইউ!

—নো, মেনসন প্লিজ, বলে রবিনসন দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

বেশ সাজানো গোছানো অফিস। রবিনসন স্বয়ং চালিত লিফটে করে বোতাম টিপে এক তলায় নেমে আসে। অফিসের সামনেই অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান। তাতে মৌসুমী ফুলের জটলা, বেশ কয়েকজন মালী এ বাগান তদারক করে। তারা এ অফিসের কর্মী এবং এ কাজে তারা বেশ অভিজ্ঞও।

অফিসের বিল্ডিংটা তিন তলা। সেই বাড়ির উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলে তবেই কোয়াপারেটিভ অফিস, বাড়িটা একতলা। সাতজন কর্মী এখানে কাজ করে। এরা এ অফিসের কর্মী নয়। এদের মাইনে-পত্তরও আলাদা। তবে অফিসের ক্যান্টিনে এরা খেতে পারে এবং অফিস ধরনের কিছু সুযোগ-সুবিধে এরা পেয়ে থাকে। এটা কম কথা নয়।

কোয়াপারেটিভের দরজা ভেজানো। ভেজানো দরজা ঠেলে রবিনসন ভেতরে প্রবেশ করে। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। এত বড় একটা অফিসে স্টাফের সব কাজ এরাই করে। সেইদিক দিয়ে এরা বাহবা পাওয়ার যোগ্য। কারণ ডেইলি উইথড্রয়াল; যা সপ্তাহে দু'বার করা যায়, তাছাড়া, লোন বহু রকমের আছে। একজন স্টাফে তা ভালোভাবে চালিয়ে নিচ্ছে। তবে ওদের সময় বিশেষে অফিস স্টাফেরাও সাহায্য করে।

টমসন এখানকার অ্যাকাউন্টটেন্ট। এক কথায় এখনকার ইনচার্জ তাকে বলা যায়। বয়স পঞ্চাশের কাছে। ভারী ধরনের চেহারা, মাথার চুল ছোট করে ছাটা। চোখ ততটা কটা নয়। একটা কালচে ভাব আছে, প্রায় পাঁচ ফুট সাত আট ইঞ্চি লম্বা হবে।

টমসন রবিনসনকে প্রবেশ করতে দেখে এক গাল হেসে বলে, আরে রবিনসন। এসো, এসো, গুড মর্নিং।

—গুড মর্নিং, রবিনসন গম্ভীর মুখে অভিবাদন জানায়। এরপর বলে, বড় বিপদে পড়ে গেছি। তাই আপনার কাছে এলাম।

টমসন কি যেন লিখতে যাচ্ছিল। তা তার লেখা হোল না। সে পেন থামিয়ে বলে, বিপদ? তোমার? কি হয়েছে?

রবিনসন ওর বাবার খবর সংক্ষেপে জানিয়ে বলে, এখুনি বাড়ি রওনা দিচ্ছি। কিছু বাড়তি টাকা নিয়ে যেতে চাই। তাই এ সময়……।

টমসন রবিনসনের কথায় গুরুত্ব উপলব্ধি করে। তাই ওকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে বলে, তোমার এখন কত টাকা হলে চলে।

—যতটা আপনার পক্ষে সম্ভব হয় তাই দিন। জানি, এটা আমার পক্ষে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবু উপায় নেই। রবিনসনের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

—হাজার দশেক হলে কাজটা চালিয়ে নিতে পারবে?

—দশ হাজার?

—হ্যাঁ।

—সত্যি বলছেন?

—হুঁ।

—কথাটা আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

—মানুষের এ অবস্থায় কেউ কখনো ঠাট্টা করে না, অন্ততঃ আমি করি না। আমার তাতে বাধে।

—মিঃ টমসন, আপনার মত মানুষ হয় না।

—না, না। ও সব কিছু না। তুমিও এক সময় নিঃস্বার্থভাবে আমার জন্য করেছো। তাই আমিও…।

—প্রতিদান বলছেন?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারো।

—তবু অনেকে তা করে না।

—কিন্তু আমি তা করতে চেষ্টা করি।

—সেইজন্যই তো আপনি অনেকের থেকে আলাদা।

—তুমি আমাকে অনেক বাড়িয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলছো। আমি তোমার জন্য তেমন কিছু করছি না।

—কিছু করছেন না?

—উহুঁ, টমসন মাথা দু'দিকে দোলায়।

—বাঃ, দশ হাজার দিতে চাইছেন এটা কম কথা নাকি!

—যেমন দেবো, তেমন তেমন মাসে মাসে তোমার মাইনে থেকেও কেটে নেবো। এর জন্য তোমায় সুদও দিতে হবে। তবে এটা ঠিক, আমাদের কোয়াপারে টিভের সুদ ব্যাংক থেকে কম।

—তবে দেখুন, আমি কত সুবিধে পাচ্ছি। গায়ে লাগবে ঠিকই, তবু মাসে

দিতে হবে বলে এত কষ্ট হবে না।

—দাঁড়াও, তোমার টাকার ব্যবস্থা করছি।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

—তুমি এই উইথড্রয়াল স্লিপে সই করো।

রবিনসন তা করে টমসনের দিকে এগিয়ে দেয়, এই নিন। টমসন স্লিপের উপর চোখ বুলিয়ে পাশে ঘসঘস করে কি যেন লিখে দিয়ে ওটা রবিনসনের দিকে এগিয়ে দেয়। এটা ক্যাশিয়ারকে দাও এবং কি ধরনের নোট নেবে তা বলে দাও।

—টাকার নোট একটু বড় হলেই ভালো হয়। তাহলে ক্যারি করতে সুবিধে হবে। স্যুটের বুক পকেটেই নিয়ে নিতে পারবো।

তারপর সেই মত টাকা নিয়ে রবিনসন টমসনকে আর এক দফা ধন্যবাদ জানিয়ে টাকা পকেটে রেখে বাস রাস্তায় এসে হাজির হয়। এখান থেকে বাসে বা ট্যাক্সি করে রেল স্টেশনে সে যাবে। এরপর ওখান থেকে গাড়ি ধরবে। গাড়ি পেতে খুব একটা দেরি না, তাও পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে।

রবিনসন স্টেশনে পা দিয়েই টিকিট কেটে নেয়, কারণ দুরেপাল্লার গাড়ি একটা বেরিয়ে গেছে, আবার কখন আর একটা গাড়ি আসবে তার কিছু ঠিক নেই। আর গাড়ি কখন তা কে জানে! এ সময় সে কখনো যায়নি।

রবিনসন একজন প্যাসেঞ্জারের কাছে এগিয়ে যায় এবং তার গন্তব্য স্থলের নাম বলে জানতে চায়, কখন গাড়ি আছে জানেন?

—বারোটার আগে পাবেন না, প্যাসেনজার জানায়। আমিও তো ঐ গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে আছি। একটুর জন্য আমার আগের গাড়িটা মিস হয়ে গেল।

—ও, রবিনসন এর বেশী কিছু বলে না।

আকাশে হঠাৎ মেঘের গর্জন হতে রবিনসন আকাশের দিকে তাকায়। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। উল্টো পাল্টা হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়া তো নয় যেন গায়ে তীর বিঁধিয়ে দিচ্ছে। তবে কুলওভারের উপর স্যুট পরে থাকায় ঠাণ্ডা কিছুটা কম লাগছে।

রবিনসন ভাবে, বর্ষাতিটা সঙ্গে আনা উচিত ছিল। না এনে সে রীতিমতন বোকামি করেছে। আনা মানে তাকে আবার অ্যাপার্টমেন্টে ছুটতে হতো। অন্যদিন অফিসে নিয়ে গেলেও বর্ষাতি আজ অফিসে নিয়ে যায়নি। আর অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়ার মত হাতে সময় ছিল না। গেলে এ গাড়িটাও সে পাবে না।

রবিনসন ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। বারোটা আর যেন কিছুতেই বাজতে চায় না। এখনো বারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকী আছে। আর ট্রেন যদি লেট থাকে তাহলে তো কথাই নেই।

হঠাৎ রবিনসনের একটা কথা মনে পড়ে, টমের জন্য তো টয়ট্রেন কেনা হলো

না। থাক্, ওটা পরে কিনে নেবেখন। তবে এখন কিনতে পারলেই সুবিধে হতো। প্লাটফর্মে পাওয়া যায়। এখানে দাম বেশী নেয়। তা নিক কিন্তু খুচরো টাকা? তাতো তার কাছে আর নেই। টিকিট কেনার সময় যা ছিল দিয়েছে এবং সামান্য যা কিছু আছে, তা ট্রেন থেকে নেমে বাড়ি যাওয়ার জন্য লাগবে। এর বেশি কিছু খরচ করতে গেলেই কোয়াপারিটেভের টাকায় হাত দিতে হবে। না, না, তা করা চলে না। ঐ বাণ্ডিল বার করতে গেলে লোকের চোখে পড়ে যাবে। কার মনে কি আছে তা বলা যায় না। বিপদ ঘটতে কতক্ষণ অন্য সময় হলে অফিস যাত্রী পেতো। তারা সবাই পরিচিত। তার সঙ্গে থাকলে বল হতো। এখন তারা কেউ নেই। তাই এ অবস্থায় কখনো টাকা বার করা যায় না।

হঠাৎ রবিনসনের বাবার কথা মনে পড়ে। বাবার বোধ হয় টাকার জন্যই এ বিপদ হয়ে থাকবে। কারণ বাবার নাকি ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাবার কথা ছিল। বাড়ির কাছের ব্যাংকগুলো তেমন একটা চলে না বলে বাবা কিছুটা দূরে বরাবরই টাকা রাখতো। তা সে ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে। কই, কখনো এর জন্য কোন বিপদ ঘটেনি।

রবিনসন ভাবে, না অন্য কোন কারণে বিপদ ঘটেছে, যা সে জানে না। তবে যাই ঘটনা হোক, দিনের বেলায় অমন একটা জল জ্যান্ত মানুষ কোথায় যেতে পারে। সেটাই তো সব থেকে আশ্চার্য কথা হলো।

রবিনসন এসব কথা আর ভাববার সময় পায় না। হঠাৎ এক ফোঁটা বৃষ্টি তার গায়ে পড়লো। তারপরই শুরু হয়ে গেল ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। তবে সে বৃষ্টি জোরে পড়ছে না। খানিকটা ঝিরঝিরে ভাব। গায়ে যেন হাল্কা বরফের গুঁড়োর মত পড়ে চলেছে।

রবিনসন স্টেশনের লাগোয়া একটা সেডের কাছে এসে দাঁড়ায়। এবার সে হাতঘড়ির দিকে তাকায়। এখনো আট মিনিট ট্রেন আসতে বাকি আছে। ট্রেনটা দূরে থেকে আসছে। দূর পাল্লার গাড়ি। হয়তো কিছু লেট থাকতে পারে। ট্রেনের কথা কিছু বলা যায় না। বিভিন্ন কারণে ট্রেন লেট থাকতে পারে।

রবিনসনে সেডে এসে আর একজন তার পাশে এসে দাঁড়ায়। মাঝ বয়েসী লোক। হাতে চুরুট। চুরুটের গন্ধটা উগ্র নয়। তা থেকে সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। ফলে তাকে তার বনেদী মানুষ বলে মনে হচ্ছে, আর বেশভূষাও যেন সে কথা বলছে।

রবিনসন লোকটির দিকে ফিরে তাকায়, ট্রেন ক'টায় আসবে তা বলতে পারেন?

লোকটি রবিনসনের দিকে না তাকিয়ে চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলে,

ট্রেন মনে হয় সাড়ে বারোটার আগে আসবে না, একটু আগে মাইকে অ্যানাউন্স করেছে, ট্রেন আধ ঘণ্টা লেটে রান করছে।

রবিনসন ভাবে, আধঘণ্টা লেট এমন কিছু নয়। তার বেশী না হলেই হয়। ও আধ ঘণ্টা দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

রবিনসন বলে, ও। আচ্ছা আপনিও এ গাড়িতে যাবেন নাকি ?

—কেন বলুন তো ?

—না, এমনি জানতে চাইলাম।

—আপনি পুলিশের লোক নয় তো ?

—পুলিশ হতে আমি যাবো কেন !

—আপনি কোথায় কাজ করেন ?

—আমি একটা বেসরকারী অফিসে কাজ করি।

—ও। আপনাকে একটা কথা বলবো ?

—হ্যাঁ, বলতে পারেন।

—কিছু মনে কিছু করবেন নাতো ?

—না, না, মনে করার কি আছে।

—আপনি কি ব্যাংক থেকে আসছেন ?

—ব্যাংক থেকে ? আমি ?

—হ্যাঁ।

—কেন বলুন তো ?

—আমার কিন্তু তাই মনে হচ্ছে।

—না, না, রবিনসন লোকটির কথার প্রতিবাদ করে। সঙ্গে সঙ্গে তার বাবার কথা মনে পড়ে যায়। বাবাও সম্ভবতঃ ব্যাংক থেকে টাকা তোলার পরেই বিপদে পড়ে যায়। এও কি কোন গুণ্ডা দলের লোক ? কিন্তু চেহারায় তো তেমন বাজে লোক বলে মনে হচ্ছে না। সাজ পোষাকও ভদ্রস্থ। তবে এ কথাও ঠিক, চেহারা আর পোশাক-আশাক দেখে কিছুই বোঝা যায় না। কার মনে কি আছে তা সে ছাড়া অন্য কেউই জানে না।

—আপনি বোধহয় আমার কাছে ব্যাপারটা চেপে যেতে চাইছেন ? বলে লোকটি মিটি মিটি হাসে।

—না, না। আপনার কাছে চেপে যাবো কেন !

—কিন্তু আমার মন বলছে যে, আপনি আমার কাছে কিছু লুকতে চাইছেন। তারপর লোকটি পকেট থেকে চুরুটের বাক্স থেকে একটা চুরুট বার করে রবিনসনের দিকে এগিয়ে দেয়। নিন ধরান। ঠাণ্ডায় ভালোই জমবে।

— চুরুট আমি খাই না, রবিনসন একটু ইতস্তত করে 'না' জানায়। ভাবে, লোকটি সুবিধের নাও হতে পারে। তাছাড়া, তাকে দামী চুরুট অফার

করছে কেন ? চুরুটের মধ্যে কিছু মেশানো নেই তো ? থাকলেও থাকতে পারে। সে হয়তো চুরুট টানতে টানতে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

রবিনসন ভাবে, কোন একটা বিদেশী বইতে দেখেছিল, একজনের চুরুটের ধোঁয়ায় অপর পক্ষ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এবং অজ্ঞান হয়ে যেতেই অপর পক্ষ পালিয়ে ছিল না যেন কাজটা হাসিল করে নিয়েছিল। তা ঠিক তার মনে নেই। মোট কথা, চুরুটের ধোঁয়াটা অপরের পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল।

রবিনসন ভাবে, ধোঁয়া তো তার নাকে যাচ্ছে। কই, তার তো কিছু হচ্ছে না। তার পরমুহূর্তে ভাবে, ও হয়তো অন্য চুরুট ব্যবহার করছে। সুযোগ বুঝে আসল চুরুটটা ব্যবহার করবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা। লোকটি চুরুটের বাক্স বন্ধ করে পকেটে চালান করে দেয়। অনেকে অবশ্য খায় না। এর গন্ধ বহু লোকই সহ্য করতে পারে না। প্রথমটা আমারি ভালো লাগতো না।

—হঠাৎ আপনি টাকার কথা বললেন ? রবিনসন ঐ লোকটির কথা ভুলতে পারছে না। ওর মনে কি উদ্দেশ্য আছে তাও বুঝতে পারছে না।

—আপনি খুব অবাক হয়ে গেছেন, তাই না ?

—হ্যাঁ, তা আপনি বলতে পারেন।

—কারণ আপনি একটু পরে পরেই স্যুটের ইনসাইড পকেটে হাত দিচ্ছেন। তাই মনে হচ্ছে ওখানে দামী জিনিস আছে। এই যে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি তার মধ্যেই আপনি বেশ কয়েকবার ওখানে হাত দিয়েছেন।

—কই, নাতো ! রবিনসন একটু ভয় পেয়ে যায়। এ সময় তার কোন পরিচিত লোকজন এখানে নেই। থাকলে ভালো হতো।

রবিনসন ঘাড় উঁচু করে চারদিকে তাকায়। না, সে অনেক মানুষ আশে পাশে দেখছে ঠিকই। কিন্তু তার চেনা একজনও মানুষ সে দেখতে পাচ্ছে না। ফলে সে অসহায় বোধ করতে থাকে।

ইতিমধ্যে বারোটা বেজে গেছে। ট্রেনের টাইম এগিয়ে আসছে। ফলে লোকে জম-জমাট হয়ে উঠছে। এতে রবিনসন খানিকটা চিন্তিতবোধ করে। ভাবে, ট্রেন এলে ঐ লোকটার সঙ্গে এক কামরায় সে কিছুতেই উঠবে না। ঠিক অন্য কামরায় উঠে পড়বে।

—দিচ্ছেন, লোকটি মৃদু হাসে। আসলে কাজটা কতকটা আপনি নিজের অজান্তেই করে ফেলছেন। ওটা করবেন না। আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি কারণ দিনকাল ভালো নয়। কার মনে কি আছে তা অপরে বলতে পারে না। এটা আমি আপনার ভালর জন্য বলছি।

রবিনসন এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলে, আপনি কে বলুন তো ? তার যেন কেমন সন্দেহ হতে থাকে ? ও তার সঙ্গে এখন কোন হৃদ্যতা নেই যে তার

জন্য তাকে সে চুরুট অফার করতে চাইলো। একটু আগে দেখা, পরিচিত নয়। সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ একজন। সে তাকে কিনা অফার করলো!

—আমি কে? লোকটি রবিনসনের কথা শুনে হাসতে থাকে। আমার আপনি বোধহয় সন্দেহ করছেন। আপনার মনে আমার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক।

—আমি কিন্তু এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না।

—সত্যি, আমার পরিচয় চান?

—হ্যাঁ। অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

—না, না। আমার কোন আপত্তি নেই।

—তাহলে বলুন আপনি কে?

এবার লোকটি রবিনসনের একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায় এবং আস্তে কথা বলে: আমি পুলিশের লোক।

—পুলিশের লোক? রবিনসনের কথাটা ঠিক বিশ্বাস হয় না।

—হ্যাঁ।

—আপনার কথাটা ঠিক মানতে পারছি না।

—কেন? লোকটি জানতে চায়।

—তাহলে আপনি আমায় পুলিশের লোক কিনা জিজ্ঞেস করছিলেন কেন? রবিনসন এক দৃষ্টিতে লোকটির দিক তাকিয়ে থাকে। দৃষ্টি ফেরায় না। তার চোখের যেন পলক পড়ছে না কেমন যেন একটা সন্দেহ তাকে ঘিরে ধরেছে।

রবিনসন বুঝতে পেরেছে, লোকটা ঠিক সহজ লোক নয়। ওরকম হাসলে কি হবে! ওর মনে কিছু একটা আছে এবং ও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, তার কাছে টাকা বা মূল্যবান কিছু জিনিস রয়েছে। এ ধারণাটা সে কি করে পাল্টাবে? সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। তাছাড়া, তাকে এ ট্রেনেই যেতে হবে, তা এ মানুষ বেশ ভালো রকমই জেনে বসে আছে। সুতরাং এ তার পরিত্রাণ পাওয়া খুবই মুশকিল ব্যাপার। বার বার তার একটা কথা মনে হচ্ছে, কিছু একটা হয়তো ঘটতে চলেছে। যদি কিছু ঘটে সেটা খারাপই হবে। ভালো কিছুতেই হবে না।

রবিনসন ভাবে, এখন যদি সে কোন কিছুতে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তার বাড়ি ফেরা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। টাকা তো যাবেই, সেই সঙ্গে বাবার ব্যাপারেও দারুণভাবে উৎকণ্ঠায় থাকবে।

লোকটি মুখের হাসি এখনো বজায় রেখে বলে, জানেন তো, পুলিশের লোক খুব সন্দেহ বাতিক হয়। ঘরের স্ত্রীকে পর্যন্ত সন্দেহ করতে তারা ছাড়ে না।

—পুলিশের তো সব ব্যাপারেই সন্দেহ।

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। এ বদনাম আমাদের আছে।

—আমি কি করে বুঝবো যে, আপনি সত্যি পুলিশের লোক ?

—আমার মুখের কথা কি যথেষ্ট নয় ?

—উহুঁ।

—আসলে প্রমাণ চান, তাই না ?

—তা বলতে পারেন।

—কিন্তু আমাদের আইডেনটিটি সব সময় প্রকাশ করতে নেই। তাতে আমাদের নানা কারণে অসুবিধেয় পড়তে হতে পারে।

—কিন্তু আমি বুঝবো কি করে যে আপনি পুলিশের লোক। এখন এটা জানা আমার পক্ষে বিশেষ দরকার।

—দরকার ? হ্যাঁ, তা বলতে পারেন কারণ আমি আপনার ব্যাপারে কিছু জেনে ফেলেছি।

—মোটেই কিছু জানেননি। রবিনসন কথাটা বললো বটে, তবে তেমন জোর দিয়ে বলতে পারলো না।

—যাক্, সেটা আপনার ব্যাপার।

—যদি পথে আমার কোন বিপদ ঘটে ?

—হ্যাঁ। তা তো ঘটতেই পারে।

—ঘটতে পারে ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—আপনি এখনো একটু আগের মত স্যুটের ইনসাইড পকেটে একবার হাত রাখলেন। এটাই আপনার বিপদের কারণ হতে পারে। এ কথা আপনাকে বলে আমি সাবধান করে দিতে চাইছি। পরবর্তীকালে এটাই আপনার বিপদের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

—প্লিজ! কথাটা একটু আস্তে বলবেন।

—ও! সরি। আমি বোধহয় একটু জোরে কথা বলে ফেলেছি। কথা শেষ করে লোকটি রবিনসনের দিকে তাকায়। আপনি আমার সঙ্গে এক কামরায় উঠবেন ?

—আপনার সঙ্গে ?

—হ্যাঁ। লোকটি মাথা দোলায়।

—কেন বলুন তো ?

—আপনার ভালোর জন্যই সে কথা বলছি।

—আমার ভালো ? কথার মধ্যে রবিনসন যেন অপর পক্ষকে হুল ফোটাতে চায়। তারপর মনে মনে বলে ওঠে। তা আপনার না ভাবলেও চলবে। শুধু

দয়া করে আমার কোন ক্ষতি করবেন না।

রবিনসন এ কথা অপর পক্ষকে বলতে পারে না। বলাও যায় না। বলাটা মোটেই শোভন নয়। কারণ ও পক্ষ এখনো তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে চলেছে। হয়তো তার মধ্যে মুখোস পরা থাকতে পারে।

লোকটি বলে, নিশ্চয়ই।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটলো। তার জন্য রবিনসন একবারে প্রস্তুত ছিল না। এ রকম যে একটা ঘটতে পারে তা সে আদৌ কল্পনাই করতে পারেনি। ফলে সে রীতিমতন হকচকিয়ে যায়। সেই সঙ্গে সে বিব্রত বোধ করতে থাকে।

তিন চারজন লোক এসে লোকটির কাছে ঘিরে দাঁড়ায়। সবাই ভদ্র জামা কাপড় পরে আছে। তাদের মুখে একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে, সেই সঙ্গে কিছুটা ব্যস্ততাও রয়েছে।

এদের মধ্যে একজন সেই লোকটিকে বলে, আমাদের ইনফরমেশন কারেক্ট।

লোকটির মুখ স্বাভাবিক। সেই ভাবেই সে বলে, কারেক্ট যে তা তুমি কি করে বুঝলে? রঙও তো হতে পারে।

অন্য একজন বলে, স্যার, কনট্রোল থেকে সরে এসেছে।

লোকটি এবার যেন সহসা সজাগ হয়ে ওঠে। কনট্রোল থেকে খবর জানিয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার।

অন্য একজন বলে, স্যার, এই ট্রেনেই নাকি আসছে।

—এটা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম এবং সেইমত আমি এখানে চলে এসেছি। লোকটি জ্বলন্ত চুরুটে একটা লম্বা টান দেয়।

—হ্যাঁ স্যার, আপনার অনুমানই ঠিক।

—তোমরা চারজন আছো। সবাই দু'চারটে কামরা বাদ দিয়ে উঠবে। আমি গাড়ির পাশের কামরায় থাকবো। কিন্তু বেতাল দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে আমায় ফোন করে জনাবে।

—ইয়েস স্যার।

—এখন তোমরা আর আমার সঙ্গে কথা বলো না। ভিড়ের মাঝে মিশে যাও। বি কেয়ার ফুল। এই অ্যাটেম্পট যেন আমাদের মিস না হয়। তাহলে সেই অথৈই জলে গিয়ে আবার পড়বো।

—আশা করি এবার ও আমাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

— বেস্ট অফ লাক।

—থ্যাংক ইউ স্যার!

রবিনসন এতক্ষণ সব কথাই শুনেছে। এবার সে লোকটিকে আর খারাপ ভাবতে পারছে না এবং ও যে খুব বড় পোস্টে কাজ করে তা ওদের কথাবার্তা

শ্বনেই বোঝা যাচ্ছিল।

রবিনসন একটু ইতস্তত করে বলে, আপনি তাহলে সত্যি সত্যি প্বলিশের লোক ? এখন সে একটু লজ্জিতও।

—কে বললো ? লোকটি সামান্য হাসে। হেসে সে ঘড়ির দিকে তাকায়। বারোটা কুড়ি। আর দশ মিনিট বাকি।

—আমার মনে হচ্ছে।

— মনে হয় আপনার ধারণাটা মিথ্যে নয়। আপনি আমার সঙ্গে এক কামরায় উঠবেন। তাহলে বিপদের হাত থেকে এড়াতে পারবেন। নইলে আপনার বিপদ কেউ র্খতে পারবে না।

—আসলে জানেন, আমার মাথার এখন ঠিক নেই।

—কেন, আপনার কি হয়েছে ?

—আমার বাবা কাল থেকে মিসিং। আমি সেই খবর পেয়ে অফিস থেকে ছ্বটি নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি।

—প্বলিশে জানিয়েছেন ?

—সেটা জানাতেই যাচ্ছি।

—এটা প্রথমেই জানানো উচিত ছিল।

—আপনি ঠিকই বলেছেন, আসলে আমার বোনেরা প্বলিশের ঝামেলায় যেতে চায়নি, আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

—আপনি গিয়েই প্বলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আর যদি গিয়ে দেখেন বাবা ফিরে এসেছে তাহলে তো কোন কথাই নেই। বলেই লোকটি একবার চারদিকে তীক্ষ্ব দ্ষ্টি ব্বলিয়ে নেয় এবং চুর্বটে একটা লম্বা টান দেয়।

— এবার আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো যদি কিছ্ব মনে না করেন। রবিসন নরম সুরে কথা বলে।

—হ্যাঁ করতে পারেন।

—আজকাল সব জায়গাতেই তো জানেন, রেফারেন্স ছাড়া খ্বব একটা ভালো কাজ হয় না।

—সব ক্ষেত্রে ঠিক এটা খাটে না, তব্ব অনেক ক্ষেত্রে যে ঘটে না তা বলা যায় না, বলে লোকটি মাথা নাড়ে।

—তাই আপনার রেফারেন্সটা যদি পাই···। আসলে কি জানেন, আমি বাবার একমাত্র প্বত্র সন্তান। তাই যা করতে হবে তা আমাকেই করতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি জানেন, প্বলিশের কাছে সহজে যেতে চাই না। রবিনসন সত্যি কথাটা বলে।

—অর্থাৎ প্বলিশকে আপনি ভালো চোখে দেখেন না।

—তা নয়। আসলে ওদের হাত থেকে দ্বরে থাকতে চাই।

—আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি।

—আপনি যদি এক কলম লিখে দিতেন বা আপনার একটা আইডেনটিটি কার্ড দিতেন।

—এই নিন। তবে একান্ত দরকার না হলে এটা ব্যবহার করবেন না। বলে লোকটি স্যুটের ইনসাইড পকেট থেকে একটা আইভরি কার্ড বার করে রবিনসনের দিকে এগিয়ে দেয়।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, বলে রবিনসন কার্ডের দিকে চোখ বোলায়। লোকটির নাম, টমাস মুর। অ্যাসিসটেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ।

—না, না, এতে ধন্যবাদের কি আছে! আর শুনুন, কামরায় উঠে আপনি আমার পাশের সীটে বসবেন, কিন্তু আমার সঙ্গে কোন কথা বলবেন না।

—আমার তা মনে থাকবে।

—মনে হয় ট্রেন আসছে। সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে।

—হ্যাঁ ট্রেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঠিক সাড়ে বারোটার মধ্যেই এলো। তবে আধ ঘণ্টা লেট, পথে মেকাপ করে নিতেও পারে।

টমাস এ কথার কোন জবাব দিল না। তার দৃষ্টি এখন ট্রেনের দিকে এবং তার মধ্যে একটা ব্যস্ত ভাব ফুটে উঠেছে।

রবিনসন যখন বাড়ি পৌঁছলো তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, মনের দিক দিয়ে সে অনেকটা ভেঙে পড়েছে। দরজায় কলিং বেল বাজাতে গিয়ে তার টমের কথা মনে পড়ে। ওর জন্য টয় ট্রেন কেনা হয়নি। তাড়াহুড়োতে মনেও ছিল না আর যখন মনে পড়লো তখন আবার হাতে সময় ছিল না।

রবিনসন ভাবে, এখানে টয় ট্রেন পাওয়া যাবে না। তারা যেখানে থাকে সেটা বলতে গেলে একবারে অজ পাড়া গাঁ। দৈনিক কিছু জিনিস পত্তর পাওয়া গেলেও বিশেষ কোন জিনিসের দরকার পড়লে এখান থেকে কিছুটা দূরে যেতে হবে। তবে এখানকার পরিবেশ মনোরম। শহরের মত ঘিঞ্জি এলাকা নয়। গ্রাম্য পরিবেশ হলেও মোটামুটি প্রায় সব জিনিসই পাওয়া যায়। না গেলেও এখানকার লোকেদের খুব যে একটা অসুবিধে হয় তা নয়। এটা তারা খানিকটা মানিয়ে নিয়েছে। তবে এ কথা ঠিক, আধুনিক শহরের হাওয়া এখানে বইতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে এখন অনেক বাড়িতেই গ্যাস, ফ্রিজ, টি. ভি, ইত্যাদি এসে গেছে। আস্তে আস্তে আধুনিকতার রূপ নিচ্ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে ঝগড়া-ঝাটি, খামার নিয়ে দলাদলি, সংঘর্ষ ইত্যাদি।

মানুষের সেই সরল মন হারাতে বসেছে। প্রাণ খোলা হাসি মুখের লোক পাওয়া যায় না বললেই চলে। হৃদয়ের কাছাকাছি মানুষও ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে।

রবিনসন কলিং বেলে পুশ করে। দু'বার বাজাতে হয় না। প্রায় সাথে সাথে এসে সুশান দরজা খুলে দেয়।

সুশানকে দেখে রবিনসন প্রথম কথা বলে, বাবা ফিরেছে ?

—নারে ! সুশানের ভেঙে পড়া গলা, কি হবে ?

—কি আর হবে ! রবিনসন বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলে, বাবা ঠিক ফিরে আসবে ! চিন্তা করিস না।

রবিনসন একথা বললো বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে বেশ মুশকিলে পড়ে গেছে ! কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না, এখানে এখন কোনো বন্ধু বান্ধবও পাওয়া যাবে না। অনেকে উইক এণ্ডে আসে, আবার কেউ কেউ আসেও না। শহরের মোহে পড়ে গেছে।

রবিনসন ঘরে ঢুকতে রোজি বলে, এসেছিস। তোর কথাটাই ভাবছিলাম ! কি হলো বলতো ?

রবিনসন এদের সাহস যোগায়, সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর স্যুটের ইনসাইট পকেটে হাত দিয়ে নোটের প্যাকেটটা দিদির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, এটা সাবধানে রাখ্। এতে দশ হাজার টাকা আছে।

—বোধ হয় লোন করে এনেছিস ?

—হ্যাঁ, এছাড়া, কি করবো বল্। এরপর চেয়ারে দেহের ভার ছেড়ে দিয়ে রবিনসন বলে, আমায় এক কাপ গরম কফি দে। খেয়ে গিয়ে থানা পুলিশ করি।

হঠাৎ একটা কথা রবিনসনের মনে পড়তে বলে, স্থানীয় হাসপাতাল এবং কিছুটা দূরের হাসপাতালেও ফোন করেছিলি ?

—হ্যাঁ, ওখানে বাবার নামের কোন পেসেণ্ট নেই এবং আমি বার বার অনুরোধ করে বলেছি, ঐ নামের কেউ যদি ভর্তি হয় তাহলে যেন আমায় ফোন করে জানায়। বলেছে, জানাবে।

—করলেই ভালো। এসময় জন থাকলে খুব সুবিধে হতো।

এই জনের সঙ্গেই সুশানের বিয়ে হচ্ছে। ও এখানেই থাকতো। চাকরির সুবাদে এখন তাকে ইয়র্কশায়ারে থাকতে হচ্ছে। বিয়ের আগের দিন আসবে। তার আগে আসতে পারবে না তা বলে গেছে।

রোজি বলে, সত্যি, জন থাকলে খুব সুবিধে হতো। তাছাড়া, পুলিশ মহলেও ওর কয়েকজন বন্ধু ছিল। তারা এখন বদলি হয়ে গেছে কিনা তা কে জানে। আর সময় খারাপ হলে তখন আর কাউকেই পাওয়া যায় না। এ আমি অনেকবার দেখেছি।

ইতিমধ্যে টম এসে রবিনসনের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ও খেলার কথা মনে আনলো না। দাদু বাড়ি নেই তাতে ও রীতিমতন মুসড়ে পড়েছে, দুষ্টুমি

করছে না। নিজেই নিজের মনে বাড়ি সংলগ্ন বাগানে পাশের বাড়ির একটা মেয়ের সঙ্গে একটু আগে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মেয়েটা ওর চেয়ে বয়সে কিছুটা বড়। রবিনসন পকেট থেকে সেই আইভরি কার্ডটা বার করে বলে, আমি পুলিশের একটা ভালো রেফারেন্স পেয়েছি। এটা হয়তো কাজে লেগে যেতে পারে। বড় পোস্টে কাজ করে।

রোজি কার্ডটা হাতে নিয়ে বলে, এতে নিশ্চয়ই কাজ হবে। তা এর সঙ্গে কোথায় আলাপ হলো ?

রবিনসন তা সংক্ষেপে জানিয়ে বলে, প্রথমে আমি লোকাল থানায় যাচ্ছি। তারপর ওখান থেকে হাসপাতালে যাচ্ছি।

রবিনসন একটু থেমে আবার বলে, বাবা কোথাও যাবে বলেনি তো ? বাবা তো ও রকম কখনো করে না।

—না, না, তাহলে তোকে এভাবে ফোন করে নিয়ে আসি। আমাকে কোথাও যাবার কথা বলেনি, সুশানকেও জিজ্ঞেস করেছি। ও-ও বলেছে, আমাকে বাবা কিছু বলেনি। বললে ও নিশ্চয়ই বলতো এত ভুলো মনের মেয়ে ও নয়।

তারপর রোজির একটা কথা মনে হওয়ায় বলে, কয়েকদিন ছুটি নিয়ে এসেছিস তো। তুই চলে গেলে আমাদের খুব মুশকিল হবে।

—হ্যাঁ, বিয়ের পরেই একবারে যাবো।

—বাঁচালি।

টম আর ওদের কথার মাঝে বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না, এধরনের কথাবার্তা ওর আদৌ ভালো লাগছে না। ও গুটি গুটি পায়ে বাগানের দিকে এগিয়ে যায়। যদি ঐ বড় মেয়েটার দেখা পায়।

ইতিমধ্যে সুশান কফি ও কিছু খাবার নিয়ে হাজির, খেয়ে নে দাদা। সেই অফিস থেকে কখন বেরিয়েছিস। আবার এখন বেরুবি, কখন ফিরবি তার কিছু ঠিক নেই।

—আমার এসব খেতে একদম ইচ্ছে করছে না। রবিনসন মুখ কুঁচকে বলে। তবে খিদে যে পায়নি তা নয়। তবু কি খাওয়ার মত তার মানসিকতা নেই। থানা পুলিশ করা যে কি ঝামেলা তা যে করে সেই একমাত্র বোঝে। তাদের অফিসের এক ভদ্রলোক পুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল। সে যে কি মানসিক যন্ত্রণা, দুর্ভোগ, তা সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। লোক বাধ্য হয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে কেস তুলে নিয়েছিল। দু'তিন দিনেই তার হাড় মাস কালি হয়ে গেছিল। সে সব কথা সে শুনেছে, তাই পুলিশের ব্যাপারে যেতে তার একবারে মন চাইছে না, কিন্তু এখন না গিয়ে তো উপায় নেই। তাকে যেতে হবেই। তবু রবিনসন খাবে না খাবে না করেও সামান্য কিছু মুখে দিয়ে

কফিটা খেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর দিদির দিকে তাকিয়ে বলে, আমার ফিরতে দেরি হতে পারে। তার জন্য চিন্তা করবি না। কারণ থানা থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে, এটা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

—হ্যাঁ ঠিক আছে, রোজি মাথা নাড়ে। সঙ্গে কিছু টাকা পয়সা আছে তো? কখন কি লাগে তা তো বলা যায় না। ওদিকে সুশান একটা বর্ষাতি নিয়ে এসে দাদার হাতে দেয়, আকাশে মেঘ রয়েছে। বৃষ্টি নামতে পারে।

—হ্যাঁ, রবিনসন আর জানায় এরপর সে টেবিলের উপর থেকে ছোট ফোলডিং ছাতাও তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সেই সঙ্গে কিছু টাকাও নেয়, তবে তার যাওয়া হলো না।

রবিনসনের একটা কথা মনে হওয়ায় সে যেতে যেতে অমনি ঘুরে দাঁড়ায়, এর মধ্যে বাবা ফিরে এলো বা কোথাও থেকে ফোন করলে, আমায় সঙ্গে সঙ্গে থানায় এবং এর থেকে একটু দেরি হয়ে গেলে স্থানীয় হাসপাতালে ফোন করবি।

—ঠিক আছে, রোজি মাথা নাড়ে।

—বাবার বন্ধুরা তো কিছু বলতে পারছে না, তাই না।

—হুঁ। রোজি মাথা নাড়ে।

এরপর রবিনসন রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। আকাশে বেশ মেঘ করেছে। কোথাও তারা দেখা যাচ্ছে না। এলোমেলো বাতাস বইছে। সেই হাওয়ায় একটা শিরশিরে ভাব। বৃষ্টি হয়তো এখুনি নামবে না। তার তোড়জোড় চলেছে। তবে বৃষ্টি হবে না যে এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। নামলেই হলো, এ বৃষ্টি এই আছে এই নেই।

রবিনসনের বাড়ির থেকে স্থানীয় থানা খুব একটা দূরে নয়। হাঁটা পথেই যাওয়া যায়। তবে মিনিট দশেক সময় নেয় এই আর কি।

রবিনসন থানার উদ্দেশ্যে হেঁটেই চলেছে। এখন চারিদিকে নিয়ন বাতির ছড়াছড়ি। দোকান পাটও অনেক হয়েছে। রাস্তা ঘাটও প্রায়ই সারানো হয়। আগের মত হাড় জিরজিরে অবস্থা আর নেই। এখানকার পরিবেশই একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছে। টি. ভি. ফ্রিজ ও গ্যাসের দোকানও মোড়ের মাথায় একটা হয়েছে, যেখান দিয়ে একটা রাস্তা বাঁ দিকে। অন্যটা ডান দিকে ঘুরে গেছে আর ডানদিকটা ধরে আর একটু এগিয়ে গিয়েই চৌরাস্তার মোড়। ওখানটা এখানকার তুলনায় কিছুটা জমজমাট এলাকা।

হঠাৎ একটা লোক এসে রবিনসনের কাছে এগিয়ে এসে বলে, দেশলাই হবে।

—হবে। রবিনসন পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে লোকটার দিকে এগিয়ে দেয়।

এ জায়গাটা কিছুটা অন্ধকার মত। দূরে নিয়ন বাতি থাকলেও কয়েকটা বড় বড় গাছ থাকার ফলে আলোটা এখানে তেমন জোরদার হয়ে উঠতে পারেনি। আর বাতাস থাকার ফলে একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে। গাছগুলো দুলছে। তবে ভারি গাছ হাওয়ায় একে অপরের গায়ে হেলে পড়ছে না। না পড়লেও পরিবেশ করে তুলেছে ভৌতিক।

—ধন্যবাদ! বলে লোকটা দেশলাইটা রবিনসনের দিকে এগিয়ে দেয়। তারপর সে বলে। আপনি তো এ গ্রামের ছেলে, তাই না? বলে সে ওর দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ। তা বলতে পারেন।

—এখন তো শহরে চাকরি করেন।

—এটাও ঠিক বলেছেন।

—আপনার নাম তো মিঃ রবিনসন গোমস্।

—এটাও আপনার ভুল হয়নি।

—হবে না জানতাম বলে লোকটা সিগারেটে একটা টান দেয়।

—আপনি কোথায় থাকেন?

—সম্প্রতি আপনাদের এ অঞ্চলে এসেছি। সঙ্গে আর সিগারেট না থাকায় আপনাকে দিতে পারলাম না। তার জন্য আমি দুঃখিত।

—না, না। এর জন্য লজ্জা পাবার কিছু নেই। এ রকম অনেক সময়ই হয়ে থাকে। এরপর রবিনসন লোকটার দিকে ভালো করে তাকায়।

লোকটার বয়স পঁয়ত্রিশের মত হবে। লম্বা ধরনের চেহারা। তা প্রায় মাথায় পাঁচ ফুট আট দশ ইঞ্চি হয়ে যাবে। মাথার চুল তেমন বড় নয়। চলার ধরনের মধ্যে সে যে বেশ চটপটে এবং শক্তি ধরে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

রবিনসন বৃষ্টি না পড়লেও বর্ষাতিটা গায়ে পরে নিয়েছে। তেমন ভারি নয়। হাল্কা ধরনের। ছাতাটা বাঁ হাতে রয়েছে। সেটা ডান হাতে নিয়ে বলে। এবার একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতাম।

—নিশ্চয়ই করবেন, আমি তো আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

—কেন বলুন তো?

—বলছি। তার আগে আমায় কি জিজ্ঞেস করবেন বলেছিলেন।

—হ্যাঁ। আপনি আমার ব্যাপারে এত সব জানলেন কি করে?

—জেনেছি আমার স্বার্থে।

—আপনার স্বার্থে? রবিনসন অবাক না হয়ে পারে না। ভ্রূ কুঁচকে সে লোকটার দিকে কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ঠিক ব্যাপারটা সে বুঝতে পারে না।

—হ্যাঁ। তা বলতে পারেন। লোকটা মিটিমিটি হাসে। তারপর সে

সিগারেটে একটা লম্বা টান দেয়। মনে হয় বৃষ্টি নামবে। হাওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। আপনার সঙ্গে বর্ষাতি ও ছাতা দুটোই রয়েছে আমার এসব নেওয়া ধাতে পোষায় না। বৃষ্টি হলে ভিজি তাও ভালো। মাঝে মধ্যে কেন প্রায়ই সর্দি কাশির কবলে পড়তে হয়।

রবিনসন এ কথার কোন রকম মন্তব্য প্রকাশ না করে আগের কথার জের টেনে সে বলে, আপনার সঙ্গে আমার কি স্বার্থ জড়িয়ে থাকতে পারে তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বললেই বুঝতে পারবেন।

ইতিমধ্যে তেড়ে বৃষ্টি নামলো। তার আগে বার কয়েক এলোমেলো বাতাস বইলো। দু'জনের মাঝে যখন কথা হচ্ছিল তখন একে অপরকে ছেড়ে কখনো যাওয়া যায় না। সেটা বড় অশোভন দেখায়। তার উপর অপর পক্ষের হাতে ছাতা বা বর্ষাতি কিছুই নেই। ফলে ওরা দু'জনে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়ায়। গাছটা বেশ বড় হওয়ায় বৃষ্টি লাগছে না। তবে এ রকম জোরে বৃষ্টি পড়লে একটু পরে হয়তো বৃষ্টি গায়ে এসে লাগবে। কিন্তু একটু পরে বৃষ্টির জোর কমে এলো। এখন ঝির ঝির করে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। তাতে যেন দু' পক্ষই বাঁচলো।

রবিনসন লোকটার দিকে তাকায়। সে তাকানোর ইঙ্গিত লোকটা বুঝতে পারে। তাই সে বলে, ঐ যে মোড়ের মাথায় নতুন গ্যাস, ফ্রিজ, টি. ভি.. দোকান হয়েছে, ওর আমি একজন পাটনার, আমি চাই আপনি আমার ওখান থেকে কিছু কিনুন।

—গ্যাসের দরকার আমার।

—পেয়ে যাবেন, লোকটা উৎসাহিত, হয়।

—কিন্তু সিলেণ্ডারের অভাব হবে না তো ?

—মোটেই না।

—ঠিক আছে। আমি এখন চলি। বৃষ্টিটাও ধরে এসেছে। এ ব্যাপারে পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে।

—পরে কেন এখুনি কথাটা হোক, আর এ ব্যাপারে আমি আপনাকে বিশেষ সুবিধে দেবো, যা অন্য কোথাও পাবেন না, তা আমি হলপ করে বলতে পারি।

—বলছি তো, পরে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলবো।

এদিকটা বড় নির্জন। লোকজনের যাতায়াত প্রায় নেই বললেই চলে। মাঝে মধ্যে একটা আধটা গাড়ি থেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

—তা আপনি এখন কোথায় চলেছেন ?

—একটা বিশেষ দরকারী কাজে। রবিনসন লোকটার কাছে ভাঙতে চায়

না। এভাবে দেরি করিয়ে দেওয়ার জন্য এবার লোকটার উপর তার রাগ হতে থাকে। এখন কথা বলার মত তার মনের অবস্থা নেই। তার উপর একটা উটকো লোক, যাকে সে কোনদিন দেখেছে বলেও মনে করতে পারছে না। তার সঙ্গে এত কথা কিসের।

—কিছু না, কিছু প্রয়োজনীয় কাজ মানুষের সব সময়ই থাকে। তারই মাঝে দু' দণ্ড সময় করে নিতে হয়। বলে লোকটা হাসে।

লোকটার হাসি রবিনসনের আদৌ ভালো লাগছে না। কেমন যেন একটা গায়ে পড়া ভাব। তার সঙ্গে যেন আঠার মত লেগে রয়েছে।

রবিনসন এবার একটু রেগে কথা বলে। এবার আমি যাবো। আমার একটু তাড়া আছে।

—তাড়া আমারও আছে।

—আপনার তাড়াটা আমার দেখার বিবেচ্য বিষয় নয়। বলে রবিনসন সামনের দিকে পা বাড়াতে যায়। বাধা পায়। ফলে তার যাওয়া হলো না।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান, এত তাড়া কিসের। লোকটা রবিনসনের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। একটু পরে নয় যাবেন। থানায় যাবেন, এই তো? ওখানে একটু পরে গেলেও চলবে।

রবিনসন কটমট করে লোকটার দিকে তাকায়, কিন্তু একটা কথা ভেবে সে অবাক হচ্ছে যে, ওই লোকটা কি করে জানলে যে সে থানায় চলেছে।

—থানার দরজা সব সময় খোলা থাকে। কখনো বন্ধ হয় না। বলে লোকটা নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলো। তারপর হাসি থামিয়ে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে সিগারেটটা টুসকা মেরে বাইরে ফেলে দেয়।

—আমি থানায় যাচ্ছি, সে কথা আপনাকে কে বললো? রবিনসন লোকটাকে পাল্টা প্রশ্ন করে।

—কেউ বলেনি।

—তাহলে আপনি জানলেন কি করে?

—এরকম কিছু খবর আমাদের জেনে রাখতে হয়।

—জানতে হয়, তাই না? রবিনসন চিবিয়ে চিবিয়ে বলে।

—হ্যাঁ, লোকটা মাথা নাড়ে।

—আপনার জানাটা কিন্তু ভুল হয়েছে।

—ভুল হয়েছে? লোকটা নিজেকে দেখিয়ে বলে।

—হুঁ, রবিনসনের কি রকম যেন একটা সন্দেহ হতে থাকে, লোকটা কি মতলবে তার সঙ্গে এভাবে যেচে কথা বলতে এসে থানায় যাবার প্রশ্নে তার কাছে জবাবদিহি করছে।

—আমার? মোটেই না।

—যাক্, আপনার ধারনা নিয়ে আপনি থাকুন। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। রবিনসন কথা বলো, বলছে বটে, কিন্তু লোকটার উপর ক্রমশ তার সন্দেহ বাড়ছে। ও নিশ্চয়ই কোন একটা কু মতলবে আছে এবং সেটা না জানা পর্যন্ত সে অস্বস্তি বোধ করছে।

—কিন্তু তাতে আমার আসে যায়।

—তাতে আমার বয়েই গেল।

—বেশী গোঁয়ার্তুমি করবেন না।

—গোয়ার্তুমি মানে ?

—আপনি এখন থানায় যেতে পারবেন না।

—থানায় যাবো না ?

—না! লোকটা স্পষ্ট জবাব দেয়।

—কেন বলুন তো ?

—যা বলছি তাই করুন।

—তাই করবো ? বলে রবিনসন হাসে, কিন্তু হাসিটা একটু পরেই মিলিয়ে যায়। দু'ঠোঁটের মাঝে সে বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। এখন সে বুঝতে পারছে, বাবা কোন জালে জড়িয়ে পড়েছে। তা থেকে তিনি সহজে বের হতে পারবেন না। আর ঐ লোকটা ওদের দলের। ও তাকে তাই থানায় যেতে দিতে চাইছে না। গেলেই ব্যাপারটা অনেকটা জানা জানি হয়ে যাবে। তাতে ওদের বিপদ বাড়তে পারে। এর জন্য তাকে ভয় দেখাচ্ছে যাতে সে থানায় না যায়। পরে গেলেও ওরা কিছু সময় পাবে। তখন নিজেদের কিছুটা গুছিয়ে নিতে পারবে।

—হ্যাঁ, ভালো ছেলের মত ঘরে ফিরে যান। লোকটা কর্কশ গলায় কথা বলে। নইলে আপনার বিপদ বাড়বে বইতো কমবে না। এ কথা আমি আপনাকে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি।

—আপনার হুকুমকে আমায় বলতে হবে নাকি ?

—আপাতত তাই।

—আপনার কথা আমি মানতে পারছি না।

—আমার কথা আপনাকে মানতে হবে।

—তা মানার জন্য আমি কি আপনাকে দাশকত লিখে দিয়েছি নাকি! রবিনসন জোরের সঙ্গে কথা বলে প্রমাণ করতে চাইছে যে লোকটার শাসানিতে সে এতটুকু বিচলিত হয়নি এবং তাকে সে থোড়াই কেয়ার করে।

—দেখুন, এত কথা বলার মত আমার সময় নেই। যা বলছি তাই করুন, নইলে আপনিই আপনার বিপদ ডেকে আনবেন।

—আপনি কে ?

—তা জানার আপনার কোন দরকার নেই।

—দরকার আছে। আপনি কোন দলের হয়ে কাজ করছেন?

—বললাম তো তা জেনে আপনার কোন প্রয়োজন নেই।

—আছে, আছে। রবিনসন লোকটার দিকে একটু ঝুঁকে তাকায়। আমার বাবা কোথায়? দয়া করে তাকে ছেড়ে দিন, আর ক'দিন পরে আমার বোনের বিয়ে।

ওর উত্তরে ও লোকটা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বাধা পেল, তার বলা হলো না।

রবিনসন আবার বলে, ওরা আপনাকে কত টাকা দেবে?

—ওসব কথা জেনে আপনার লাভ কি?

—আমি আপনাকে পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করবো।

—তা পুষিয়ে দেবেন? লোকটার চোখ দুটো অন্ধকারের মধ্যেও যেন আয়নার মত চকচক করে ওঠে, কিন্তু তা নিমেষের জন্য। তারপর সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, ওসব ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

—আপনি জানেন। নইলে কিছুতেই আমায় এভাবে পথরোধ করতে চাইতেন না। তবে ঠিক আছে, আমায় থানায় যেতে দিন।

—যেতে দিতে পারি না। আমার উপর সে রকম নির্দেশ দেওয়া আছে। লোকটা আস্তে আস্তে হিংস্র হয়ে যেন একটা বন্য জানোয়ারে পরিণত হচ্ছে। আপনি ফিরে যান।

—ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

—নয় কেন?

—তাহলে আমার বাবাকে ফিরিয়ে দিন।

—ফিরিয়ে দেবার মালিক আমি নই।

—আপনি আমায় ক্লু দিন, তাহলেই কাজ হবে। বাকিটা আমি পুলিশ নিয়ে করে নেবো। তার জন্য আমি আপনাকে টাকা দিচ্ছি।

এর জবাব না দিয়ে লোকটা সামান্য চেঁচিয়ে কথা বলে, আপনি এখান থেকে চলে যাবেন, না অন্য কিছু করতে আমায় বাধ্য করাবেন?

—আমি চলে যাবার জন্য আসিনি।

—চলে আপনাকে যেতেই হবে। বলেই লোকটা পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে রবিনসনের দিকে উঁচিয়ে ধরে।

রবিনসন তাতে বেশ ভয় পেয়ে যায়। রাস্তার চারদিকে তাকায়। এখনো রাস্তা আগের মতন জন বিরল, দু'একটা গাড়ি যা ধেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

তবু রবিনসন বলে, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখতে পারতেন। একথা বলে ও অপর পক্ষকে বোঝাতে চায়।

—অযথা অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। আপনি বাড়িতে ফিরে যাবেন কি না, তাই আমি শুনতে চাই।

—না, আমি যাবো না, রবিনসন ত ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে কথা বলে। ভাবে, লোকটা এতে হয়তো কিছুটা ভয় পেয়ে যেতে পারে। কেউ তার চিৎকার শুনে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। পুলিশ পেট্রলও এসে পড়া আশ্চর্যের কিছু নয়।

কিন্তু এসব কিছুই হলো না, আর ঐভাবে চেঁচিয়ে কথা বলাই রবিনসনের কাল হলো। লোকটা হঠাৎ তেড়ে এসে ওর পেটে ঘুঁসি মারে। তাতে ও নুয়ে পড়তে ওর মাথায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করতে ও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারায়।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়। যেতে যেতে চাপা গলায় বলে, উইলিয়ামের সঙ্গে টক্কর দিতে এসেছে!

এখন প্রায় রাত আটটা বাজে। রোজি ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। এই একটু আগে টম ডিনার সেরে ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন দৌড় ঝাঁপ করার পর সন্ধে হতে না হতেই গা ছেড়ে দেয়। অনেকদিন না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

এক সময় হাঁটা বন্ধ করে রোজি বলে, রবিনসন সেই গেল তো গেলই। ফিরবার নাম নেই।

সুশানও বলে, সত্যি, দাদা এত দেরি করছে কেন তা বুঝতে পারছি না। না ওখান থেকে অন্য জায়গায় গেছে তাই বা কে জানে।

—তা যাবে কেন! যাবার তো কোন কথা নেই।

—যাবার কথা তো অনেক সময় ঠিক থাকে না। তবু যেতে হয়, নইলে বাবারই বা এ ঘটনা ঘটবে কেন! এর মধ্যে যদি জন এসে পড়তো তাহলে বেশ ভালো হতো। পুলিশ লাইনে ওর কিছু জানাশুনো ছিল, এ ব্যাপারে দাদাকে সাহায্য করতে পারতো।

—এত দূর থেকে ওর পক্ষে আসা সম্ভব নয়। ওর কথা আমার মনে হয়েছিল। ওকে আর কষ্ট দিতে চাইনি, ও এখন কাছে থাকলে তো খুবই ভালো হতো। ওর বেশ উপস্থিত বুদ্ধিও আছে।

ইতিমধ্যে টেলিফোনটা বেজে ওঠে। রোজি একবার টেলিফোনটা বাজা মাত্রই এক রকম দৌড়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নেয়, হ্যালো।

—আপনি কে বলছেন?

—আমি রোজি কথা বলছি।

—রবিনসনের বোন।'

—'হ্যাঁ।'

—আপনাকে একটা খারাপ খবর দেবো।

—খারাপ খবর ? রোজি যেন কাঁপিয়ে ওঠে।

—হুঁ।

—তা খবরটা কি ?

—রবিনসনের অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে।

-রবিনসনের ? সে কি ?

—হ্যাঁ, এটা আমায় দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে।

—আপনি কে কথা বলছেন ?

—আমি রবিনসনের বন্ধু।

—আপনার নাম কি ?

—আমার নাম বললে আপনি আমায় চিনতে পারবেন না।

—ও। তা রবিনসন এখন কোথায় আছে ?

—ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—কোন হাসপাতালে ?

—কিংসটনে।

—আমি এখুনি আসছি। তা ও কেমন আছে ?

—জানি না। কেবিনে যেতে দিচ্ছে না।

—ও। তা ওর অ্যাকসিডেণ্ট কি করে হলো ?

—এত জানি না। তবে ওকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছি।

—ও গড ! আমি এখুনি রওনা দিচ্ছি।

তারপর রোজি রিসিভার নামিয়ে রাখতে সুশান বলে. দাদার আবার কি হলো ? ওর ভেঙে পড়া গলা। একটার পর একটা বিপদ আসছে। কথার শেষে ওর চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে।

—সবই কপাল। নইলে এরকম হওয়ার কি কথা ছিল। রোজিকে খুবই বিমর্ষ দেখাতে থাকে। কি শুভক্ষণে যে এখন আমার বিয়েটা ঠিক হলো। একটা না একটা বিপদ আসছেই।

—ও কথা ভেবে মন খারাপ করিস না, রোজি সুশানকে সান্ত্বনা দেয়। তোর কপালে যা আছে তা তো কেউ নিতে পারবে না। নে, আমি আর দেরি করতে পারছি না, যাচ্ছি।

—গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে যা, যাবি আর আসবি। বেশী দেরি করবি না। আমি বড় চিন্তায় থাকবো, আর তেমন কিছু না হলে দাদাকে নিয়ে আসবি। বাড়িতেই আমরা ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাবো। তাতে একটু বেশী খরচ হয় হবে। বিয়ের আগে দাদাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে। দাদা অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকলে আমার মোটেই ভালো লাগবে না।

—আমি তোর মনের অবস্থা বুঝি।

—শোন্, আমি চলি। তুই কিন্তু বাড়িতেই থাকবি, আর এর মধ্যে বাবা ফিরে এলে 'কিংস্টনে' ফোন করবি। আমি ওখানেই থাকবো। কেমন আছে কে জানে।

—দিদি, দাঁড়া।

—কেন?

—কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে যা। ওখানে টাকার দরকার হতে পারে।

—ঠিক বলেছিস। আমার মাথায় এখন কিছুই আসছে না।

—আমার মাথাও কোন কাজ করছে না, হঠাৎ কথাটা মনে এলো বলেই বললাম। তুই টাকা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়্।

—হ্যাঁ, বলে রোজি বাইরের দিকে পা বাড়ায়।

ইতিমধ্যে সুশান গ্যারেজের চাবি নিয়ে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে দিদির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

ছোট মডেলের ফোর্ড গাড়ি, ছোট হলেও বেশ শক্ত সামর্থ গাড়ি। ইঞ্জিন ভালো। বেশ হার্ডি গাড়ি, গাড়ির রং কালো।

সুশান গাড়ি থেকে নেমে আসতে রোজি চালকের সীটে এসে বসে, তারপর গাড়ি স্টার্ট করে চলে যায়।

'কিংস্টন' হাসপাতালে ওদের বাড়ি থেকে খুব একটা দূরে নয়। হাঁটা পথে খানিকটা সময় লাগলেও গাড়িতে মিনিট দশেকের বেশী সময় লাগে না।

এখন রাস্তা আরো নির্জন হয়েছে। অদূরে নিয়ন বাতি জ্বললেও রাস্তার ধারে বড় বড় গাছের জন্য অনেক জায়গা আলো আঁধার হয়ে উঠেছে। এরই মাঝে গাড়ির হেড লাইট জ্বালিয়ে তীর বেগে ছুটে চলে যাচ্ছে।

বৃষ্টি এখন আর নেই, তবে আকাশে এখনো যথেষ্ট মেঘ রয়েছে। এখনো বৃষ্টি না হলেও রাতে হয়তো বৃষ্টি নামবে। উত্তর দিকে নতুন করে মেঘ জমছে আর এখন জোরে বাতাস না বইলেও আস্তে আস্তে বাতাস বইছে। এর ফলে তেমন কনকনে ভাব নেই, তবু একটা রেশ আছে।

অন্য সময় রোজি এত জোরে গাড়ি চালায় না। ও একটু হিসেবী মেয়ে। কখনো বেহিসেবী কাজ করতে চায় না। সব সময় পুলিশ রুল মেনে চলে, কিন্তু এখন বেশ জোরেই গাড়ি চালাচ্ছে। আসলে মনের অস্থিরতাই তাকে এ কাজ করাতে বাধ্য করাচ্ছে।

খুব তাড়াতাড়ি 'কিংস্টন' হাসপাতালে পেঁছে রোজি পার্কিং জোনে গাড়ি রেখে দ্রুত গাড়ি থেকে বের হয়। তার মুখে আতঙ্কের চিহ্ন, গিয়ে শুনবে কি তার ঠিক নেই। একটু আগেই ফোনে বলেছে যে, রবিনসনকে কেবিনে নিয়ে গেছে।

রোজি গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক রোজির সামনে এসে

দাঁড়ায়। বলে, আপনি রবিনসনের দিদি, তাই না ?

—হ্যাঁ। ও কেমন আছে ?

—রবিনসনকে 'মেরি ল্যাণ্ড' হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

—'মেরি ল্যাণ্ডে' ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—এখানে ভালো অ্যারেঞ্জমেণ্ট নেই বলে। তাই ডাক্তাররা কোন রকম ঝুঁকি নিতে চায়নি।

—ওখানে নিয়ে যাবার এটাই কি কারণ ?

—হ্যাঁ। ওখানে নানা রকম মর্ডান ইকুইপমেণ্টস আছে এবং চিকিৎসার সুযোগ সুবিধেও বেশী।।

—তা অবশ্য ঠিক।

—আমি সে কারণেই এখানে আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

—থ্যাঙ্ক ইউ! রোজি লোকটার দিকে তাকায়।

লোকটার চেহারা পলকা ধরনের। তবে লম্বা আছে। টিকলো নাক। ধারালো চোখ, প্রশস্ত কপাল, বয়স ত্রিশ ছাড়িয়ে গেছে। এরই মধ্যে মাথার চুলে সামান্য পাক ধরেছে। সম্ভবতঃ পেটের গোলমাল আছে।

রোজি চিন্তিত স্বরে বলে, তাহলে তো এখুনি 'মেরিল্যাণ্ড' হাসপাতালে যেতে হয়। বলে সে হাত ঘড়ির দিকে তাকায়, প্রায় ন'টা বাজতে চলেছে। ভাবে, কখন বাড়ি ফিরতে পারবে তা কে জানে। সুশান দারুন চিন্তা করবে।

—হ্যাঁ, লোকটা মাথা নাড়ে। আমি আপনার সঙ্গে যাবো কি ? অবশ্য যদি আপনার দরকার হয়।

—নিশ্চয়ই দরকার হবে। আপনি সঙ্গে থাকলে তো খুবই ভালো হয়। মানুষের বিপদে জনবল বড্ড প্রয়োজন হয়।

তারপর রোজি দু'পা এগিয়েও বলে, দাঁড়ান, ইনকোয়ারিতে একটা কথা বলে আসি।

—ঠিক আছে, আপনি যান। আমি এখানেই দাঁড়াচ্ছি।

আচ্ছা, রোজি ইনকোয়ারির দিকে পা বাড়ায়।

ইনকোয়ারিতে একটি মেয়ে বসে আছে। তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়স হবে। চোখ কটা। বব করা চুল ঘাড়ের কাছে ঝাঁকড়া গাছের মত ছড়িয়ে রয়েছে। পরণে স্কার্ট। স্কার্টের রং হাল্কা ঘিয়ে, তার উপর ফুল হাতা সোয়েটার। সোয়েটারের উপরের দিকে একটা বোতাম খোলা। পায়ে হাই হিলের জুতো এবং স্কিন কালারের মোজা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত এসেছে।

মেয়েটির কাছে গিয়ে রোজি বলে, আমার পেসেণ্ট এখানে ছিল। পরে এখান

থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। আমি সে ব্যাপারটা বাড়িতে জানাতে চাই। আপনার এখ ন থেকে একটা ফোন করা যাবে? কথার মধ্যে দিয়ে সে অনুরোধ জানায়।

—আপনার ফোন নাম্বারটা বলুন।

রোজি বাড়ির ফোন নাম্বার জানিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানায়।

—আপনি এখানে বসুন। আমি ট্রাই করছি।

—থ্যাঙ্ক ইউ। বলে রোজি সামনের একটা গদি আঁটা চেয়ারে বসে। ভাবে, লাইনটা তাড়াতাড়ি যেন পায়। সুশানকে খবরটা জানিয়েই তাকে আবার 'মেরিল্যাণ্ড' ছুটতে হবে। এসব ফিস তার সয় না। মনের দিক দিয়েও সে ক্ষতবিক্ষত।

রোজির কপাল ভালো। তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি, মিনিট কয়েক পরেই ইনকোয়ারির মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলে, লাইন পেয়ে গেছি। আপনি কথা বলুন।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! বলেই রোজি তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে নেয়, হ্যালো, সুশান?

—হ্যাঁ। তুই কোত্থেকে কথা বলছিস?

—আমি কিংস্টন থেকে কথা বলছি।

—দাদা কেমন আছে?

—রবিনসন এখানে নেই।

—তবে কোথায় আছে?

—'মেরিল্যাণ্ডে।'

—কেন? অবস্থা খুব খারাপ নাকি?

—না, না, তার জন্য নয়। ওখানে ভালো চিকিৎসা হবে বলে। তুই চিন্তা করিস না। আমি ওখানে যাচ্ছি। তাই তোকে খবরটা জানালাম। আমার ফিরতে দেরি হবে।

—আমার খুব ভয় করছে।

—ভয়ের কিছু নেই, রোজি কথাটা বললো বটে তবে হাত পা তার যেন বুকের মধ্যে সিঁধিয়ে যাচ্ছে।

—তুই আমার কাছে চেপে যাচ্ছিস নাতো?

—না, না, চেপে যাবো কেন! নে ছাড়ছি।

—শোন্, শোন্।

—বল্, কি বলবি?

—ওখানে পৌঁছে দাদা কেমন আছে দেখে আমায় সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবি। আমি কিন্তু দারুন চিন্তায় আছি।

—আচ্ছা, আচ্ছা, ফোন করবো। তা হ্যাঁরে, বাবা ফিরেছে?

—না, সুশানের মুষড়ে পড়া গলা। ওর প্রায় কান্না পেয়ে যাচ্ছে, ভাবে, একটার পর একটা খারাপ খবর আসছে। এরপর যদি দাদার কিছু হয়ে যায় তাহলে সে আর বাঁচবে না।

—ঠিক আছে, ছাড়ছি।

—আমি তোর ফোনের অপেক্ষায় রইলাম।

—এত চিন্তা করিস না।

তারপর সুশান রিসিভার নামিয়ে রেখে ইনকোয়ারির মেয়েটিকে আর এক দফা ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে একটু আগের লোকটা রোজিকে অনুসরণ করে ওর কাছে এগিয়ে আসে এবং ওর দিকে তাকিয়ে বলে। আপনার আপত্তি না থাকলে আমি গাড়ি ড্রাইভ করতে পারি, কারণ এ অবস্থায় আপনার মানসিক অবস্থা ভালো না থাকাই স্বাভাবিক।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি গাড়ি চালালে ভালোই হয়। তাছাড়া আমার মাথাটাও ঝিমঝিম করছে।

তারপর লোকটা চালকের আসনে বসতে রোজি তার পাশের সীটে বসে। এটা ভদ্রতা। নইলে পিছনে বসলে বড় অভদ্রতা দেখায় সেটা করা মোটেই শোভন নয়। এটা করতে তার সৌজন্যতায় বাধে।

গাড়িটা হাসপাতালের এলাকা পিছনে ফেলে বড় রাস্তা ধরলো। এভাবে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর বাঁ দিকে টান নেয়। এ রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তা। লোকজনও কম।

'মেরিল্যান্ড' হাসপাতালটা যে রোজি চেনে না তা নয়। তবে ওদিকে সে বড় একটা যায় না। তার পক্ষে বেরুট। ভাবে, এ রাস্তা দিয়ে গেলে বোধহয় কিছুটা তাড়াতাড়ি হবে। সব রাস্তা তো তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

খানিকটা যাবার পর গাড়ি আরো নির্জন রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করেছে। এটা একবারে পুরনো পাড়া। বাড়ি ঘরদোরও বহু পুরনো আমলের। এসব দেখলে মনে হয় যেন আধুনিক সভ্যতা বহু পিছনে পড়ে রয়েছে।

রোজির যেন কেমন একটা সন্দেহ হতে থাকে। তবু সে চুপ করে থাকে। ভাবে, এ মানুষ কি তার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করতে পারে! এরপর খানিকটা ইতস্তত করে সে বলে। এদিক দিয়ে গেলে কি আমরা তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পৌঁছতে পারবো?

—না। লোকটা বাইরের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়।

—তবে এদিক দিয়ে যাচ্ছেন কেন?

—এ দিক দিয়ে গাড়ি যাবে?

—তার মানে ?

—আমার কথাটা কি বোধগম্য নয় ?

—না হলেও জানতে চাইছি, এ রাস্তা দিয়ে কেন যাচ্ছেন ? রোজি ঈষৎ চেঁচিয়ে কথা বলে।

—এটাই পথ।

—'মেরিল্যান্ডের' এটা রাস্তা নয়। আপনি কি ভেবেছেন, ঐ হাসপাতাল আমি চিনি না ? আমি ওটা বেশ ভালো করেই চিনি।

—তাহলে আর অযথা তর্ক করছেন কেন! যেমন বসে আছেন তেমন বসে থাকুন। তাতে আপনার মঙ্গল হবে।

—আমার মঙ্গলের কথা আপনাকে আর ভাবতে হবে না। রোজির কেমন যেন একটা সন্দেহ হতে থাকে। সত্যি করে বলুন, রবিনসন কোথায় ? তার কি হয়েছে ?

—হয়তো এতক্ষণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

—হয়তো কেন বলছেন ?

—কারণ আমি তো হাত গুণতে জানি না।

—তাহলে আপনি কি করে বলছেন যে, ঐ হাসপাতাল থেকে ওকে সরিয়ে এনে 'মেরিল্যান্ডে' ভর্তি করা হয়েছে।

—আমার কাছে সে রকম খবরই আছে।

—ও! তার মানে আপনি সঠিকভাবে কিছুই জানেন না।

—হ্যাঁ, কথাটা সেরকমই দাঁড়ায়।

—তাহলে আপনি আমায় কোথায় নিয়ে চলেছেন ?

—ভয় নেই আপনার কোন ক্ষতি করবো না।

—আপনি এখুনি গাড়ি থামান। নইলে আমি চেঁচাবো। কথাটা রোজি বললো বটে, কিন্তু শত গলা ছেড়ে চেঁচালেও কোন লাভ হবে না। রাস্তায় কোনো। লোক চলাচল নেই বললেই চলে। তার উপর রাত বাড়ছে। নির্জনতা ভয়ংকর ভাবে সবকিছু যেন গ্রাস করে চলেছে।

গাড়ি একটু পরেই থামবে। চেঁচাবেন না, চেঁচিয়ে কোন লাভও হবে না। আর যদি চেঁচান তাহলে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনবেন এবং এসব যদি কিছু না চান তাহলে চুপটি করে ভালো মেয়ের মত বসে থাকুন।

আপনি গাড়ি থামাবেন কি না তাই বলুন! রোজি জোরের সঙ্গে কথা বলে অপর পক্ষকে ভয় দেখাতে চাইছে। যদিও সে নিজে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পাড়ছে। তার বেশ ভয়ও করছে। এ রকম অবস্থায় সে কোনদিন পড়েনি এবং তার মাথা ধরাটা ঠাণ্ডা হাওয়ায় কিছুটা কমে এসেছিল। এখন সেটা আরো বেড়ে চলায়, তার মাথা কোন কাজ করছে না।

রোজি এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে, বাবার না আসার পিছনে একটা চক্র কাজ করছে এবং সে চক্র বেশ শক্তিশালী। এদেরই খপ্পরে বোধহয় কেন নিশ্চয়ই রবিনসন পড়েছে। ওদের কাছ থেকে এত সহজে ওর মুক্তি হবে না। আর এখন সেও এদের জালে ধরা পড়লো।

এসব ভাবনার মাঝে গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক কষে একটা পড়ো বাড়ির সামনে দাঁড় করায়। বাড়িটা কম করে একশো দেড়শো বছরের পুরনো হবে। বাইরের প্লাস্টার অনেক জায়গার খসে পড়েছে। বেশ কয়েক জায়গার ইঁটও বেরিয়ে পড়েছে। বাড়িটা এক তলা। এ বাড়ি দু' তলা তিন তলা হলে বোধহয় এতদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না। কবে ভেঙে পড়তো। নেহাত পুরনো বাড়ি বলেই ওর অস্তিত্ব এখনো বজায় আছে।

—রোজি কর্কশ গলায় কথা বলে, ওখানে থামলেন কেন? বলে ও চারদিকে তাকায়। রাস্তায় একটা আলো টিমটিম করে কোন রকম জ্বলছে। যেন একশো বছরের বৃদ্ধের ছানি পড়া চোখের জ্যোতি।

—এখানে আমাদের নামতে হবে?

—কেন? এখানে নেমে কি হবে।

—সেটা আপনি গিয়েই দেখবেন!

—গাড়ি থেকে আমি নামবো না।

—নামতে আপনি বাধ্য।

—আপনার হুকুম নাকি?

—প্রথমে এখন অনুরোধ করছি। পরে এটা হুকুমেই দাঁড়াবে। লোকটা তারপর গলার সুর পাল্টে নরম গলায় বলে। শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে কেন ঝামেলা করছেন।

—আপনি আমায় মিথ্যে কথা বলে যেখানে সেখানে এনে তুলবেন তাতে আমি বাধা দেবো না? রোজি জ্বলন্ত চোখে কথাগুলো বলে চলে। ভেবেছেন কি? যা খুশী তাই করবেন। আমি গাড়ি থেকে কিছুতেই নামবো না।

—আবার গোয়ার্তুমির কথা বলছেন? ভালোয় ভালোয় গাড়ি থেকে নামবেন, না আঙুল বেঁকাতে হবে।'

—আমি গাড়ি থেকে কিছুতেই নামবো না।

—অযথা জিত ধরবেন না, বলে লোকটা সহসা পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে রোজির দিকে উঁচিয়ে ধরে। এবার নিশ্চয়ই গাড়ি থেকে নামবেন?

—আপনার মতলবটা কি সত্য করে বলুন তো?

—আপনি গাড়ি থেকে ও বাড়িতে যাবেন।

—কিন্তু কেন?

—আমি এর বেশি কিছু জানি না। আমার উপর এরকম নির্দেশ দেওয়া

আছে।

—নির্দেশ দেওয়া আছে? রোজি চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে।

—হ্যাঁ, লোকটা মাথা নাড়ে। এখনো তার হাতে উদ্যত পিস্তল।

—সে নির্দেশ কে দিয়েছে?

—তা বলা আমার মানা আছে।

—আমার বাবা কোথায়?

—জানি না।

—রবিনসন?

—সেই একই জবাব।

—তাহলে হাসপাতালের খবরটা একেবারে মিথ্যে?

—তা আমার জানা নেই।

—তাহলে কোনটা জানেন আপনি? রোজি ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে ওঠে।

—আপনার ব্যাপারটা আমি জানি।

—কি জানো? সেটাই আমি জানতে চাই। আর এ ভাবে মিথ্যে কথা বলে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করার মানে কি!

—এত মানে ফানে আমি জানি না। তোমার উপর আমার যা নির্দেশ আছে তাই বললাম। এখন সেটা মানো না মানো তোমার ব্যাপার। না মানলে বাধ্য হয়ে আমায় চরম পন্থাটা বেছে নিতে হবে। তবে সেটা ঘটুক তা আমি চাই না।

এর উত্তরে রোজি কি যেন বলতে যাচ্ছিল। তা বলতে পারলো না। সে বাধা পায়। তাই সে চুপ করে যায়।

লোকটা একটু থেমে আবার বলে, এবার গাড়ি থেকে নেমে এসো। পিস্তল একটু আগের মত এখনও রোজির দিকে উঁচিয়ে আছে।

—আমি নামবো না।

—নামতে তোমায় হবেই, বলে এক ঝাপটায় বাঁ হাত দিয়ে গাড়ির দরজাটা খুলে লোকটা রোজিকে টেনে রাস্তায় নামায়।

—রোজি কঁকিয়ে ওঠে। ভাবে, ও যেন মানুষ নয়। একটা অশুর। যে জায়গাটা ধরে নামিয়েছে সেখানটা যন্ত্রণা করতে থাকে।

তবু রোজি চেঁচিয়ে কথা বলে, আমি ও বাড়িতে গিয়ে কি করবো?

—ও বাড়িতে তোমার নেমন্তন্ন আছে।

—নেমন্তন্ন আছে? আমার? ওখানে?

—হ্যাঁ। লোকটা রোজিকে বাঁ হাত ধরে টানতে টানতে ও বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে থাকে।

এরপর লোকটা বাড়িতে ঢুকে একটা ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ায়। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ। তবে বাড়িটা বাইরে থেকে যতটা ভাঙা চোরা মনে হয়েছে, ভেতরটা কিন্তু ততটা খারাপ নয়, অন্ততঃ বাড়ির ভেতরটা দেখে তাই মনে হচ্ছে।

লোকটা কলিং বেল পুশ করার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে দরজা খুলে একটা মেয়ে বেরিয়ে আসে। মেয়েটার বয়স বাইশ তেইশ বৎসর হবে। চেহারার ধাঁচ সামান্য মোটার দিকে। মানে বয়সের তুলনায় একটু ভারিক্কি চেহারা।

লোকটাকে দেখে মেয়েটা বলে। আসতে পেরেছো ?

—হ্যাঁ ডার্লিং, বলে লোকটা ফ্ল্যাটে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে। আমাকে ড্রিংকস দাও। অনেক ধকল গেছে।

—সব সাজানো আছে, মেয়েটা জানায়। এরপর মেয়েটা লোকটার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রোজির দিকে তাকায়। এই চেয়ারে বোস। আজকের রাতটা আমরা সবাই মিলে সেলিব্রেট করবো এবং তুমি আমাদের গেস্ট।

রোজি এর কোন জবাব দেয় না। স্পষ্ট বুঝতে পারে, শত হাত-পা ছুঁড়লেও এখান থেকে তার মুক্তি নেই। তার উপর ফ্ল্যাটের দরজা-জানালা সমস্ত বন্ধ। আর এলাকাও তো জনশূন্য।

রোজি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তার দেহ কাঁপছে, পা টলছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। ফলে সে অসহায় ভাবে ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

রোজি যেখানে বসেছে ওখানে আরো দুটো চেয়ার পাতা আছে। তবে সব মামুলী ধরণের চেয়ার। ঘরের আসবাবপত্রও তাই। শৌখিনতার কোন ছাপ নেই।

ফ্ল্যাটটা মন্দ নয়। মেঝেতে লম্বা লম্বা ফাটলের চিহ্ন। রঙিন মেঝে। দেয়ালের কয়েক জায়গায় নোনা লাগলেও কলি ফেরানোর ফলে ততটা খারাপ দেখাচ্ছে না।

ওদিকে মেয়েটা রোজির সামনে সেণ্টারিং টেবিলটা টেনে ওখানে ড্রিংকসের ব্যবস্থা করে এবং প্লেট করে কিছু খাবারও আনে, তা রোজিকে খাবার জন্য অনুরোধ করে।

রোজি এসবের দিকে ফিরেও তাকায় না। গোঁ ধরে থাকে। বলে, আমি কিছুতেই খাবো না। আমায় যেতে দাও।

ইতিমধ্যে ওরা রোজির দু' পাশে বসে। তারপর লোকটা হেসে বলে, তোমাকে যেতে হবে। যেতে পারবে না। তাহলে তোমাকে কষ্ট করে এখানে ধরে আনলাম কেন ?

রোজি 'না, না' বলছে বটে, সেই দুপুরের পর থেকে তার পেটে বলতে গেলে কিছুই পড়েনি। ক্ষিদের জ্বালায় তার পেটের নাড়ি টনটন করছে। ভেবেছিল, রবিনসনের সঙ্গে একসাথে খাবে। তখন আর খাওয়া হয়নি।

এরপর রোজি এক সময় ওদের হাতে নিজেকে সঁপে দেয়, কারণ এর আগে ওরা তার উপর নির্যাতন শুরু করেছিল। তা দেখে মেয়েটা খুশী হয়। অবশ্য এর একটা সঙ্গত কারণ আছে। এ ব্যাপারে সে টাকা পাবে। সে লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে, এনড্রু, তুমি তো এটাই চেয়েছিলে?

—হ্যাঁ, এনড্রু হাসে। তোমার পাওনাটাও কাল পেয়ে যাবে।

—ঠিক আছে। মেয়েটা এনড্রুকে কাছে টেনে নেয়। ওদিক রোজির মদের ভেতর ঘুমের ওষুধ মেশানো আছে। ফলে সে আস্তে আস্তে ঢুলতে থাকে এবং এক সময় সে অসাড় অবস্থায় চেয়ারে দেহের ভার ছেড়ে দেয়।

এনড্রু তা দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে এবং মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে, আমি এটাই চেয়েছিলাম। ওকে কাল সকালের পর যেতে চাইলে ছেড়ে দেবে। কোন রকম বাধা দেবে না। তবে তার আগে একটা কাজ করবে। ওকে ইচ্ছে করে আঁকা বাঁকা পথে নিয়ে তবেই বড় রাস্তায় দাঁড় করাবে। অর্থাৎ এ বাড়িটা যেন ও চিনতে না পারে। পারলে আমাদের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

—ঠিক আছে। তুমি কোন চিন্তা করো না।

—তাহলে আমি চলি।

—এখন কোথায় যাবে?

—থানায়, আমার নাইট ডিউটি আছে।

—আবার আসবে কিন্তু।

—হ্যাঁ। কাল তোমায় টাকাটা দিতে আসবো, বলে এনড্রু মেয়েটাকে একটু আদর করে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বার কয়েক এদিক ওদিক তাকিয়ে হন হন করে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। তবে, না, তাকে কেউ দেখতে পায়নি এবং রোজির গাড়িটা যাতে সহজে লোকের নজরে না পড়ে সেজন্য একটা বাড়ির আড়ালে সেটাকে রেখে আসে।

এর পরের ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটে চললো। একটু ভোর হয়েছে, হাওয়ায় একটা ঠাণ্ডা ভাব। গতকাল বৃষ্টি পড়ায় একটা শীত শীত ভাব রয়ে গেছে। গাছগাছালীতে পাখির কলরবে মুখর। একটু আগে সূর্য উঠেছে। তবে তেমন তেজ নেই। মাঝে মাঝেই সূর্য মেঘের আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছে। তবে এ সব হাল্কা মেঘ। মেঘে বৃষ্টি হবার সম্ভবনা খুবই কম।

স্মশান একই খাটে টমকে নিয়ে শুয়ে আছে। কলিং বেলের আওয়াজে সে ধড়ফড় করে উঠে বসে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিল। বসে থাকতে

থাকতে কোমর পিঠ সব টন টন করছিল। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। একেই ক্লান্ত অবসন্ন মন এরপর মনের উপর প্রচণ্ড চাপ রয়েছে।

সুশান নাইটিটা পায়ের কাছে নামিয়ে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে যায়। তবে কি মনে হতে দরজা না খুলে জিজ্ঞেস করে, কে? এখন সে আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

—আমি। দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ ভেসে আসে।

আমি কে? গলার স্বর বুঝতে পারলেও সুশান যাচাই করে নিতে চাইছে। আর সে ভুল করতে নারাজ।

—আমি রবিনসন।

—দরজা খুলছি।

সুশান দরজা খুলে দেখে, দরজার বাইরে রবিনসন দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। জামা কাপড়ের কোন কোন জায়গায় ময়লার দাগ। মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ।

সুশান দাদাকে একা দেখে বলে, দাদা, তোর সঙ্গে দিদিকে দেখছি না? অন্য কোথাও গেছে নাকি?

—তার মানে? রবিনসন আবার দুশ্চিন্তার মাঝে পড়ে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। একটা চেয়ারে বসে। তার শরীর এবং মনের উপর দিয়ে অনেক ধকল যাচ্ছে।

—কাল তোর অ্যাকসিডেণ্টের খবর পেয়ে দিদি চলে যায় এবং দিদি 'কিংস্‌টন' হাসপাতাল থেকে ফোন করে বলে যে, তোকে ওখান থেকে রিমুভ করে 'মেরিল্যাণ্ডে' নিয়ে যাচ্ছে ফর বেটার, ট্রিটমেণ্ট।

—সব সাজানো ব্যাপার। আমি এক গুণ্ডার খপ্পরে পড়েছিলাম ঠিকই, তবে আমি কোন হাসপাতালে ভর্তি হয়নি। আমাকে পথের মাঝে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে একজন ফাদার তার চার্চে আমায় নিয়ে যায়। সে একজন ডাক্তার। আমি তারই ওখানে রাতে ছিলাম আর এদিকে এসব ঘটে গেছে।

একটু থেমে রবিনসন আবার বলে, তবে আমাকে যে আঘাত করেছে, সে আমায় কিছুতেই থানায় যেতে দিতে চায়নি। তাহলে বাবার ব্যাপারটা স্থানীয় থানায় জানতে পারবে। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বাবা তোর চক্রর জালে জড়িয়ে পড়েছে।

—দিদিকেও তাহলে ফল্‌স ফোন করে নিয়ে গেছে।

—হ্যাঁ তাই। স্থানীয় থানায় আর যাওয়া যাবে না। গেলে আবার হয়তো কোন বিপদে জড়িয়ে পড়তে পারি। ফোন করাই সব চেয়ে ভালো।

বলে রবিনসন রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করতে থাকে।

—এদিকে বাবার কোন খবর নেই। কেউ ফোন করেনি। এর উপর দিদি কি অবস্থায় আছে তা কে জানে।

—হ্যালো গড়ু মর্নিং। আমি একবার থানার ইন চার্জের সঙ্গে ট্রাই করতে চাই, রবিনসন জানায়।

—মর্নিং। আপনি একটু ধরুন।

—থ্যাংক ইউ!

—হ্যালো। মর্নিং।

—মর্নিং। আমি রবিনসন গোমস্ কথা বলছি। আমার বাবা আজ দু' দিন ধরে নিখোঁজ।

—তা এতদিন পরে জানাচ্ছেন?

—আমি থানায় জানাতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমায় যেতে দেয়নি। আমাকে আঘাত করে চলে গেছে। তখন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

—সে কে?

—তাকে আমি চিনি না।

—দেখলে পরে চিনতে পারবেন?

—তা পারবো। আর এ ব্যাপারে আমার বোনও মিসিং।

—মানে, এটা ওদের কাজ বলছেন?

—হ্যাঁ।

—মিসিং কবে থেকে?

—কাল রাত থেকে।

—সে কি করে মিসিং হোল?

—কে বা কারা আমার অ্যাকসিডেণ্টের খবর দিয়ে তাকে অন্য কোথাও নিয়ে গেছে। এখন মতলব তো একটাই বোঝা যাচ্ছে।

—সে কি একা গিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—ওদের গাড়িতে না নিজের গাড়িতে?

—নিজের গাড়িতে।

—গাড়ির নম্বর কত?

—রবিনসন সেটা জানায়।

—সাবধানে থাকবেন। সাংঘাতিক দরকার ছাড়া একবারে রাস্তায় বের হবেন না এবং থানায় আসারও চেষ্টা করবেন না। কারণ একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, ওরা চাইছে না যে, খবরটা জানাজানি হয়ে যাক্। অন্তত কিছু সময়ের জন্য। তাহলেই ওরা গুছিয়ে নিতে পারবে নিজেদের।

—আমার এখন সে কথা মনে হচ্ছে।

—আচ্ছা, আপনার বাবার সঙ্গে ইদানিং কারুর সঙ্গে কোন রকম গণ্ডোগাল হয়েছে ?

—উহুঁ। আমার বাবা সে রকম লোক নয়।

—তার সঙ্গে কারুর শত্রুতা আছে ?

—না।

—এতটা আপনি নিশ্চিত হয়ে কি করে বলছেন ?

—আমার বাবাকে আমি তো জানি।

—আপনার বাবা মিসিং হয়েছে, এ কথা কেন বলছেন ?

—কারণ বাবা কোথাও বাইরে যায়নি। গেলে বলে যায়। এ ছাড়া তাঁর বন্ধু-বান্ধবদেরও ফোন করেছি। তারা সব এখানেই আছে। বাইরে যাবার খবর তারা কেউ জানে না।

এবার আপনার ঠিকানা বলুন ?

রবিনসন বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে অনুরোধ করে ও বোনের ও বাবার খোঁজটা প্লিজ তাড়াতাড়ি যোগাড় করে দিন। আর তিনদিন পরেই আমার বোনের বিয়ে। বুঝতেই পারছেন আমার মনের অবস্থা কি! তার উপর আমি নিজেও আঘাত পেয়েছি।

—আমি আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি। আমি আমার দিক দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আচ্ছা, একটা কথা আপনার বাবার নিখোঁজ হওয়ার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়। এটা বলতে পারলে আমাদের ইনকোয়ারিতে বিশেষ সুবিধে হয়।

—বাবা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনতে গিয়েছিলেন।

ও আই সি। আচ্ছা, আপনার কাউকে সন্দেহ হয় ?

—না। বাবার সঙ্গে কারুর মনোমালিন্য হতেই দেখিনি।

—ঠিক আছে, একটু পরে আমার লোক আপনার বাড়ি যাচ্ছে। ওদের কাছে আপনার বাবার এবং বোনের একটা ছবি দিয়ে দেবেন।

—হ্যাঁ, বাবার আর দিদির ছবি আছে।

—আর এর মধ্যে ওরা ফিরে এলে সঙ্গে সঙ্গে আমায় জানাবেন।

—নিশ্চয়ই।

—রাখছি, বলে অপর পক্ষ রিসিভার নামিয়ে রাখে।

সুশান দাদার জন্য উষ্ণ কফি এবং প্লেটে করে কিছু খাবার নিয়ে আসে। দাদা, এটা খেয়ে নে। কাল থেকে তোর উপর অনেক ধকল যাচ্ছে। একটু বিশ্রাম পর্যন্ত নিতে পারিসনি।

—সবই কপাল রে! বলে রবিনসন কফিতে চুমুক দেয়। আঃ।

কফির কাপটা নামিয়ে ফের রবিনসন বলে, দিদি, কেন এখনো ফিরছে না? ও কোন গুণ্ডার হাতে পড়ে থাকবে। কিন্তু কেন? বাবা টাকা আনতে গিয়েছিল। সঙ্গে টাকা থাকলে লোকের বিপদ হতে পারে কিন্তু দিদির তো ওরকম কোন ব্যাপার ছিল না। তাহলে?

—আমারও তো মাথায় কিছু আসছে না, সুশান কাতর গলায় বলে। একটু পরে টম উঠবে। উঠে তো মা মা করবে। তখন আমি কি জবাব দেবো! কতক্ষণই বা ওকে ভুলিয়ে রাখতে পারবো!

—যা হোক করে কিছু বলবি। কি আর করবি! আর এর মধ্যে ফিরে এলে তো ঝামেলা চুকেই গেল।

চেয়ারে গাটা এলিয়ে দিয়ে আবার রবিনসন বলে, আমার টেলিফোন ডাইরেকটারীটা দে তো।

—কেন ওটা দিয়ে কি করবি?

—একজন ডিটেকটিভের সঙ্গে যোগাযোগ করা একান্ত দরকার।

—এ কথা আমিও তোকে বলবো ভাবছিলাম, বাবার সঙ্গে দিদিও নিখোঁজ হলো। তাই ব্যাপারটা আমার ঠিক ভালো লাগছে না। বলে সুশান পাশের টেবিল থেকে টেলিফোন ডাইরেকটারীটা এনে দাদাকে দেয়।

সুশান একটা চেয়ার টেনে দাদার সামনে বসে ফের বলে। মিঃ টমাসকে ফোন করবি নাকি? গোয়েন্দা হিসেবে বেশ নাম করেছে। কাগজে ওর ব্যাপারে প্রায়ই খবর থাকে। আর সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, গত সপ্তাহে একটা ম্যাগাজিনে পড়লাম। মিঃ টমাস কায়রো থেকে লোমহর্ষকভাবে একটা দশ বছরের ছেলেকে উদ্ধার করলো। সে বিবরণ পড়লে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, আমিও মিঃ টমাসের নাম শুনেছি। থাকেও খুব একটা দূরে নয়। তবে আমাদের কেস নেবে কি না তা কে জানে।

—তবু তুই একবার চেষ্টা করে দেখ্। একটু ভালো করে বুঝিয়ে বল্। তাতে কাজ হলেও হতে পারে।

—দেখি, বলে রবিনসন মিঃ টমাসের ফোন নাম্বারটা বার করে একটা কাগজে লিখে নেয়। সে বাড়ির আর অফিসের দুটোই লিখেছে, কারণ এখন ও নিশ্চয়ই অফিসে থাকবে না। অফিস হয়তো দশটার আগে খোলে না। তাই সে প্রথমে বাড়িতেই চেষ্টা করবে। আর ওখানে আছে কি না তাই বা কে জানে। তদন্তের ব্যাপারে এরা প্রায়ই বাইরে যায়। তার উপর হাতে যদি অনেকগুলো কেস থাকে তাহলে এটা নাও নিতে পারে। তবু কপাল ঠুকে সে একবার চেষ্টা করবে।

তারপর রবিনসন জল খাবারের পাট চুকিয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করতে থাকে। এনগেজ, আবার ট্রাই করে। এবারও এনগেজ।

একটু থেকে রবিনসন আবার ট্রাই করে। এবার একবার ডায়াল করতেই লাইন পেয়ে যায়।

অপর প্রান্ত থেকে উত্তর ভেসে আসে, হ্যাঁ। একজন মহিলার কণ্ঠস্বর। সম্ভবত মিঃ টমাসের স্ত্রী হবে।

—গুড মর্নিং। আমি একবার মিঃ টমাসের সঙ্গে কথা বলতে চাই। উনি কি বাড়িতে আছেন ?

—গুড মর্নিং। হ্যাঁ আছেন কাল রাতেই উনি বাড়ি ফিরেছেন।

—তাহলে একটু দিন।

—আপনার সঙ্গে তাঁর কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করা আছে ?

—না।

—আপনার নাম কি ?

—আমার নাম বললে উনি আমায় চিনবেন না। ওঁনাকে আমি এই প্রথম ফোন করছি।

—কোন কেসের ব্যাপারে ?

—হ্যাঁ।

—তবু আপনার নাম বলুন ?

—রবিনসন গোমস্।

—ঠিক আছে, আপনি ধরুন।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

একটু পরে পুরুষ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে মর্নিং। টমাস হিয়ার।

—গুড মর্নিং। সকালে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। শুনলাম, কাল রাতে আপনি বাড়ি ফিরেছেন।

—ঠিক বলেছেন। এবার বলুন, আপনাকে আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি। মিঃ টমাসের জিজ্ঞাস্য।

—আমার বাবা এবং দিদি মিসিং। সেই ব্যাপারে আমি আপনার সাহায্য চাই।

—মিসিং কবে থেকে ?

—বলছি। আপনি কি আমার কেসটা নিলেন ?

—তা ঠিক এখুনি বলতে পারছি না। কেসের মেরিট বুঝে তবেই আমি নেবো। নইলে সরাসরি আপনাকে 'না' বলে দেব।

—ও আচ্ছা, আচ্ছা।

—কবে থেকে মিসিং ?

—আমার দিদি কাল রাত থেকে।

—আর আপনার বাবা ?

—আজ তিন দিনে পড়লো।

—আপনি পুলিশে জানিয়েছেন ?

—হ্যাঁ, রবিনসন সায় জানায়।

—কবে ? টমাস জানতে চায়।

—আজ সকালে।

—আজ সকালে কেন ? মিঃ টমাসের পাল্টা প্রশ্ন। আপনার বাবা বলছেন, তিন দিন মিসিং, আর দিদি কাল রাত থেকে মিসিং।

একটু থেমে টমাস আবার বলে, আপনি কি বাইরে থাকেন ?

—ঠিক ধরেছেন। এটা আপনি জানলেন কি করে ?!

—আমার অনুমান বলতে পারেন। তবু আপনার বাড়ির লোকদের এর অনেক আগেই পুলিশে জানানো উচিত ছিল।

—আসলে ওরা তো মেয়ে। তাই পুলিশে যেতে ভয় পায়।

—আমায় একটা ফোন করে দিলেই হয়ে যেত।

—ওটা ওদের মাথায় আসেনি। আর……। রবিনসন তার কথার মাঝে থেমে যায়।

—আর কি বলুন ? থামলেন কেন ?

—হ্যাঁ আপনাকে সব জানানো উচিত।

—ঠিক বলেছেন। আর কি হয়েছে ?

—আমি গতকাল থানায় যেতে পারিনি।

—কেন ?

—পথে একজন লোক আমায় আটকে দিল।

—তাকে আপনি চেনেন ?

—না।

—তারপর কি হলো ?

—সে আমায় কিছুতেই যেতে দিতে চায়নি। এরপর আমি থানায় যেতে জোরাজুরি করতে সে আমায় পিস্তলের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করে পালায়। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। একজন ফাদার আমায় পথ থেকে তুলে নিয়ে যান। তিনি একজন ডাক্তার। তাঁর ওখান থেকেই আজ সকালে ফিরছি এবং ওখান থেকে ফিরে থানায় ফোন করে আপনাকে ফোন করলাম।

—আপনার দিদি কবে থেকে মিসিং বললেন যেন ?

—কাল রাত থেকে।

—মানে যখন আপনি বাড়ি ছিলেন না।

—হ্যাঁ। আপনি ঠিক অনুমান করেছেন।

—সে কিভাবে মিসিং হলো?

—আমার অ্যাকসিডেণ্টের খবর পেয়ে সে হাসপাতালে যায়। তারপর আর ফেরেনি।

—এসব মনে হচ্ছে, একই দলের কাজ।

—আপনার ধারণাই ঠিক। আর আমাদের বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান থাকায় আমরা খুব মুশকিলে পড়ে গেছি।

—কিসের অনুষ্ঠান?

—আমার বোনের বিয়ে।

—ক'দিন পরে?

—আর তিন দিন বাকি আছে।

—তবে তো খুবই চিন্তার কথা।

—হ্যাঁ, সেই ব্যাপারে খুবই চিন্তায় আছি।

—আচ্ছা, আপনার বাবার মিসিং হবার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে বলে আপনার ধারণা?

—বাবা ব্যাঙ্কে টাকা আনতে গিয়েছিলেন।

—স্থানীয় ব্যাঙ্ক থেকে?

—না। আমাদের ওখানে এক আধটা ব্যাঙ্ক আছে ঠিকই, তবে তেমন নামী কোন ব্যাঙ্ক নেই। ফলে বাবা বরাবর একটু দূরের ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন। সেখানে বেশ নামী নামী ব্যাঙ্ক আছে।

—ও। আচ্ছা, আপনার বাবার কোন শত্রু আছে?

—নেই বলে আমার ধারণা।

—এ ধারণা হবার কারণ?

—আমার বাবা খুব ভালো মানুষ।

—ভালো মানুষের কি কোন শত্রু হতে পারে না?

—সেটা আমার ঠিক জানা নেই।

—অনেক শত্রু থাকতে পারে। যাক্, সে কথা। কত টাকা তোলার কথা ছিল বলে কিছু জানেন।

—তা প্রায় তিন লাখ টাকার মত তোলার কথা ছিল।

—তিন লাখ?

—হ্যাঁ। তার কম হবে না।

—সবটাই কি বিয়ের ব্যাপারে খরচ হবার কথা ছিল?

—না।

—তাহলে এত টাকা তোলার কথা ছিল কেন?

—বাড়ি রিপেয়ার এবং কিছু কেনাকাটারও ব্যাপার ছিল।

—ও। আই সি। আচ্ছা, আপনার বোনের ব্যাপারে কিছু বলুন।

—আমার বোন এমনিতেই খুব ভালো। তবে……।

—তবে কি?

—ও একটু রগচটা। একটুতেই রেগে যায়। স্পষ্ট কথা মুখের উপরই বলে দেয় বলে অনেকে রেগে যায়।

—ইদানীং ওঁর সঙ্গে কারুর ঝগড়া বা মনমালিন্য হয়েছে?

—সেরকম কোন খবর আমার জানা নেই।

—উনি কি ম্যারেড?

—হ্যাঁ।

—ওর স্বামী কি করেন?

—একটা আধা সরকারী অফিসে কাজ করে।

—আর কিছু বলুন?

—ওর একটু রেস কেস খেলার অভ্যেস আছে।

—রেস মানেই তো বাড়তি টাকার দরকার।

—হ্যাঁ, তা হয় বই কি!

—এ ব্যাপারে তার কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে হয়তো।

—না, না, ও সেরকম ছেলে নয়।

—আপনি এতটা নিশ্চিত কি করে হচ্ছেন?

—ও একটু রেস খেলে ঠিকই, তাই বলে ও একাজ কিছুতেই করতে পারে না।

—না করতে পারলেই ভালো। আমি আমার সন্দেহের কথা বললাম মাত্র।

—ঠিক আছে।

—আচ্ছা, আপনার বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে বললেন, তাই না?

—হ্যাঁ।

—তা ছেলেটি কি করে?

—বাইরে চাকরি করে।

—আর কিছু বলুন।

—ও এখানেই থাকতো। এখন চাকরির সুবাদে বাইরে থাকে। ছুটি-ছাটায় এখানে আসে। আবার চলে যায়।

—এখানকার ছেলে যখন তখন তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। সেই রকম জানা কথা আমায় কিছু বলুন।

—ও পড়াশুনোয় মন্দ নয়। তবে একবার ওর বন্ধুদের সঙ্গে একটা বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল।

—ব্যাপারটা কি ?

—স্মাগলিং।

—স্মাগলিং তো সহজে ছাড়া যায় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দলের সঙ্গে থাকতে হয়। নইলে তার জীবন সংশয় পর্যন্ত দেখা দেয়।

—না, না। ওর এখন দলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

—আপনি তা কি করে জানলেন ?

—ওর বাবা, এ ব্যাপারে আঁচ করতে পেরেই ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে ও পাল্টে যায়। এখন চাকরি-বাকরি করছে। কোন বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে নেই। চাকরিতেও বেশ মন বসেছে।

—বসলেও সে যে স্মাগলিং ছেড়ে দেবে এমন কোন কথা নেই।

—ওর ব্যাপারে এখন এরকম কোন কথা শোনা যায় না।

—স্মাগলিং যারা করে তারা লুকিয়ে চুরিয়েই করে।

—তা অবশ্য ঠিক, রবিনসন একটু ইতস্ততঃ করে কথা বলে।

—আচ্ছা, আপনার বাবার বিষয় সম্পত্তি কি রকম হবে ?

—খুব একটা যে বেশী তা নয়। তবু একেবারে কমও নয়।

—আপনার বাবা কি করতেন ?

—বাবার এক সময় বেশ কয়েকটা আমের ক্ষেত, ফলের বাগান ছিল।

—ছিল কেন বলছেন ?

—বাবার এখন বয়স হয়েছে। তার উপর আমি বাইরে থাকি। তাই ওগুলো বেচে দেন।

—এখন উনি কি করেন ?

—আমাদের কিছু জমিজমা আছে। উনি সেসব দেখাশুনা করেন।

—তা থেকে আয় কেমন হয়।

—ভালোই।

—আচ্ছা, আপনার বাবার অবর্তমানে তাঁর সম্পত্তির কে বা কারা মালিক হবে ? টমাস জানতে চান ?

—আমার ভাগে হয়তো বেশী আসবে। তবে বোনেরা এ থেকে বাদ যাবে না। রবিনসন এ কথা জানায়।

—এ কথা আপনি জানলেন কি করে ?

—আমার অনুমান মাত্র।

—আপনার বাবা উইল করেছেন ?

—হ্যাঁ।

—সে উইলের বক্তব্য জানেন ?

—না।

—আমার কাছে চেপে যাচ্ছেন নাতো ?

—উহুঁ ।

—সে উইল কার কাছে আছে ?

—আমাদের সলিসিটারের কাছে ।

—আপনাদের সলিসিটার কে ?

—মিঃ কে. ডি. রীড ।

—তার সঙ্গে আপনার চেনা জানা আছে ?

—না । হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছেন ?

—কেন করছি সেটা না বুঝবার মত আপনার বয়স নিশ্চয়ই হয় নি ।

—তার নামটাই শুধু মাত্র আমি শুনেছি । তিনি কোথায় থাকেন, কোন ফার্মের সঙ্গে যুক্ত । এ সব আমি কিছুই জানি না ।

—তবে জেনে রাখবেন ।

—কথাটা দু' রকম হয়ে গেল না ?

—আমি সেভাবে কথাটা বলিনি ।

—যাক্ । এবার একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?

—হ্যাঁ পারেন । বলুন ।

—আপনি আমার কেসটা নিলেন তো ?

—হ্যাঁ নিলাম । তবে কতটা কি করতে পারবো তা এখনই ঠিক আপনাকে বলতে পারছি না । একটু সময় লাগবে ।

—সে তো নিশ্চয়ই ।

—আচ্ছা । পুলিশ না নিয়েও ডিটেকটিভ অ্যাপয়েণ্ট করতে চাইলেন কেন ?

—মানে, যাতে কেসটা তাড়াতাড়ি ফয়সলা হয় ।

—না । পুলিশের উপর ঠিক বিশ্বাস রাখতে পারছেন না বলে ।

—এটা অস্বীকার করার উপায় নেই ।

—আর একটা কথা অপ্রিয় তবু বলছি ।

—আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন ।

—ডিটেকটিভ অ্যাপয়েণ্ট করলে অন্ততঃ আপনাকে প্রথমে সন্দেহ করবে না । আপনার মনে পাপ থাকলেও ।

—আপনার যা অভিরুচি ।

—এবার আপনার ঠিকানাটা বলুন ।

রবিনসন তার বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে বলে, আমি কি আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি ?

—কি ব্যাপারে বলুন তো ?

—মানে কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে আসতাম।

—না, এখন তার কোন দরকার নেই। ছাড়ছি।

—ঠিক আছে।

—ও হ্যাঁ, আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি।

—বলুন, কি বলবেন।

—আপনি যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, সে ব্যাপারটা একবারে গোপন রাখবেন। নইলে ইনভেস্টিগেশনে খুব অসুবিধে হবে।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

—আর আপনার বাবা এবং দিদি যদি এর মধ্যে ফিরে আসেন তাহলে আমায় সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন।

—অবশ্যই।

—রাখছি, বলে টমাস রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।

—এই যে শুনছেন, মেয়েটা রোজির মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে। আপনি এখন উঠুন। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

রোজির কোন সাড়া শব্দ নেই। সে অকাতরে ঘুমিয়ে চলেছে। নিঃশ্বাসের তালে তালে তার দেহ সামান্য আন্দোলিত হচ্ছে।

মেয়েটা এবার রোজির গা ধরে আস্তে আস্তে ঠেলা মারতে থাকে, এই যে উঠুন। শুনছেন।

মেয়েটা দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায়, প্রায় সাড়ে আটটা বাজতে চলেছে। এন্ড্রুর কথা তার মনে পড়ে। তাই সে তৎপর হয়ে উঠেছে। ও কাজটা ঠিকভাবে করতে পারলে সে টাকা পাবে।

আরো এই রকম কয়েকবার ডাকার পর রোজি সাড়া দেয়।

—উঠুন। আর কত ঘুমোবেন।

—আমি কোথায়? রোজি একবার চোখ খুলে মেয়েটাকে দেখে আবার চোখ বোজে। এখনো তার নেশা কাটেনি। এন্ড্রু তার মদে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল।

—এই তো এখানে। মেয়েটা জানায়। নিন, এবার উঠুন।

রোজি এবারে ভালো করে চোখ খুলে চারদিকে তাকায়। এবার তার আস্তে আস্তে সমস্ত কিছু মনে পড়তে থাকে। সাথে সাথে সে বিছানা ছেড়ে সোজা হয়ে বসে। সে অজ্ঞান হয়ে যাবার পর ওরা তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল।

রোজি হিংস্র চোখে মেয়েটার দিকে তাকায়, আর তোমার কিছু করার বাকি আছে?

—না ম্যাডাম। আপনি এবার যেতে পারেন।

কথাটা রোজি যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাবে, ভুল শুনলো কি না। যদি যেতেই দেবে তাহলে মিথ্যে কথা বলে তাকে এখানে এনে তুললো কেন? এর পিছনে একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। আর এক রাত তাকে এখানে আটকে রেখে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেল! সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে যেন তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।

রোজির কথাটা বিশ্বাস না হওয়ায় বলে, তাহলে আমি এখন এখান থেকে চলে যেতে পারি?

—ইয়েস ম্যাডাম।

—যেতেই যখন দেবে তাহলে আমায় ধরে এনেছিল কেন।

—তা তো আমি জানি না।

—জানো না?

—না ম্যাডাম।

—আমার কাছে ন্যাকা সাজার চেষ্টা করো না।

—আপনাকে আমি মিথ্যে বলছি না। আমি টাকার বিনিময়ে এ কাজ করেছি।

—তুমি এত নীচ!

—এত সব ভাবি না। যে টাকা দেয় তার হয়েই কাজ করি।

—বাঃ। ব্যবসাটা তো ভালোই। সহসা রোজি মেয়েটার হাত চেপে ধরে। তুমি আমার বাবাকে ফিরিয়ে দাও। তোমাকে আমি টাকা দেবো। বলো, তুমি কত টাকা চাও?

—আপনার বাবা কে তা আমি জানি না।

—তুমি মিথ্যে কথা বলছো। তুমি সব জানো।

—আমি মিথ্যে কথা বলছি না। বিশ্বাস করুন।

—বিশ্বাস? তোমাদের মত মেয়েকে? আসলে আমাকে চাপ দিয়ে টাকার অংকটা বাড়াতে চাইছো।

—না, না, মোটেই তা নয়।

—সেটাই আসল ব্যাপার। আমি সব বুঝি। তোমরা টাকার জন্য এমন কোন কাজ নেই যে পারো না।

—আমি আপনাকে এ কথা বিশ্বাস করাতে পারবো না। বললেও আপনি অবিশ্বাস করবেন।

—তোমরা তো অবিশ্বাস করার মতই মেয়ে। তোমাদের কাছে প্রেম, ভালোবাসা, দয়া, মায়ার কোন দাম নেই। শুধু বোঝ টাকা। টাকা পেলেই সব কাজ করতে পারো।

—হ্যাঁ। টাকার বিনিময়ে সব কাজ করি বই কি। টাকা না হলে আমাদের মত্তন মেয়েদের চলে না। মেয়েটা এবার কিছুটা রাগাতভাবে কথা বলে। আজ আমার এ অবস্থা কেন হলো জানেন? এই আপনাদের মত ভদ্রলোকের জন্য।

—থাক্, নিজের দোষ ঢাকবার জন্য আর সাফাই গাইতে হবে না। আমার যা বোঝার তা বোঝা হয়ে গেছে।

—আপনার কিছুই জানা হয় নি।

—আমি আর নোংরা ঘাটতে চাই না। বলো, তুমি কত টাকা পেলে আমার বাবার খোঁজ করে দেবে।

—আমি জানলে তবে তো আপনার বাবার খোঁজ দেবো।

হঠাৎ রোজি মেয়েটার হাত চেপে ধরে কাতর গলায় বলে, আজ থেকে তিনদিন পরে আমার বোনের বিয়ে। দয়া করে আমার বাবা ও ভাইকে ফিরিয়ে দাও। তোমাকে আমি পুষিয়ে দেবো। এই তোমাকে আমি ছুঁয়ে বলছি।

—আমি জানলে নিশ্চয়ই বলতাম। আমায় এত করে বলার দরকার ছিল না।

—তোমার সেই লোকটা কোথায়?

—ডিউটিতে গেছে।

—ডিউটি করে নাকি? রোজি মুখ বিকৃত করে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে। আর ডিউটি বলতে এসব কাজ বোঝায় নাকি?

—তা আমি জানি না।

—তা কিসের ডিউটি করে?

—পুলিশে।

—পুলিশে? রোজি চেঁচিয়ে ওঠে। তার ইচ্ছে করছে এখনই ঠাস করে ঐ মিথ্যেবাদী মেয়েটার গালে সশব্দে একটা চড় মারে। মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাওনি!

—মিথ্যে আমি বলছি না।

—মিথ্যে যখন বলছো না তখন বলো, ও কোন থানায় কাজ করে, রোজি এবার কথার সুর পাল্টে কিছুটা নরম ভঙ্গিতে কথা বলে।

—তা আমি জানি না।

—জানো ঠিকই। আসলে আমায় বলবে না। রোজি এখন আর নিজেকে চেপে রাখতে পারছে না। ওকে ভয় দেখাতে চায়। জানো তোমায় আমি থানায় দিতে পারি।

—দিতে পারেন। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমার কাছে থানা এবং এ ঘরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যে ভাবে বাঁচছি, এ ভাবে কি বাঁচা

বলে। শরীরে গোপন ব্যাধি। পেটের জন্য আরো কত কি করতে হবে তার ঠিক নেই। জেলে গেলে তবু তো কিছু দিনের জন্য সংযত জীবন যাপন করতে পারবো।

—বাঃ, বেশ ভদ্র কথা তো শিখেছো!

—এ সব কথা আপনাদের মত ভদ্রলোকদের বোঝাতে পারবো না। কেউ এখন এসব কথা বললে দুঃখও পাই না। আগে রাগ হতো। কড়া কড়া হুল বসানো কথা বলতাম। এখন এসব কিছু করিনা। অনায়াসে আপনি আমায় আরো কিছু বলতে পারেন। অন্যায় তো কিছু বলছেন না। এখন আমার এ সবই প্রাপ্য।

—যাক্, তোমার লোকটা কোন থানায় আছে তা বলো, রোজি ভাবে। কথাটা জানলেও বলবে না। কৌশলে এড়িয়ে যাবে। এ লোকটার খোঁজ পেলে সব কিছু বেরিয়ে পড়বে। তাই এ মেয়ে নিশ্চয়ই ও কাজ কিছুতেই করবে না। এ দলে ওর থাকাও আশ্চর্য্য কিছু নয়। মেয়ে বিহীন পুরুষদল বড় একটা দেখা যায় না।

—তা আমি জানি না।

—বলবে না আমি জানতাম, রোজি পার্স খুলে একটা একশো টাকার নোট ওর হাতে গুঁজে দেয়। আমাকে দয়া করো।

—টাকা আমি নিই ঠিকই, কিন্তু আমারও বিবেক বলে একটা জিনিস আছে। এখনো পুরোপুরি পশু হয়ে উঠতে পারিনি। আমি জানলে আপনাকে নিশ্চয়ই বলতাম। কথা শেষ করে মেয়েটা টাকাটা রোজিকে ফিরিয়ে দেয়।

রোজি ভাবে, মেয়েটা জানে না অথবা জানলেও সহজে মুখ খুলবে না, ভয়ে অথবা টাকার জন্য। তাই সে ভাবে, এখান থেকে এবার চলে যাওয়াই ভালো। তবে যদি সে মেয়েটার হাত থেকে মুক্তি পায়। একটু আগে মেয়েটা তাকে চলে যেতে বলছিল।

রোজি মেয়েটার চোখে চোখ রেখে বলে, এবার তাহলে আমি যেতে পারি?

—হ্যাঁ। আপনি চলে যান, মেয়েটার চোখ চিকচিক করতে থাকে। আমি আপনাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারলাম না তার জন্য দুঃখিত।

রোজি মনে মনে বলে ওঠে, থাক্, আর ন্যাকামো করতে হবে না। অনেক হয়েছে। তবে ওর চোখে জল দেখে আবার ঠিক ওকে অবিশ্বাস করতেও পারছে না।

রোজি বলে। আমার গাড়িটা কোথায়?

—এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে বাঁ দিকে যাবেন, তারপর ডান দিকে ঘুরবেন। সেখানে একটা বাড়ি দেখতে পাবেন। তার পিছনে আপনার গাড়িটা রয়েছে। সে রকম খবর আমার কাছে আছে। হয়তো ভুল নয়।

রোজি যাওয়ার আগে একশো টাকার নোটটা ঘৃণা ভবে মেয়েটার দিকে ছুঁড়ে মেরে একবারও ওর দিকে না তাকিয়ে ওর নির্দেশ মত গাড়িটার কাছে হাজির হয়। দেখে গাড়ি অক্ষত অবস্থায় আছে এবং গাড়ি স্টার্টও নিল।

ওদিকে মেয়েটা মেঝে থেকে নোটটা তুলে নেয়। তার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে। ফোটা ফোটা অশ্রুধারা তার দু গাল বেয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে।

ওদিকে আর একটা ঘটনা খুবই দ্রুত ঘটে গেল। রবিনসনের বাবা রবার্ট ফিরে এসেছে। বলা যায় একবারে অক্ষত শরীরে। তবে মানসিক দিক দিয়ে সে রীতিমতন বিপর্যস্ত।

তবে রবার্টকে দেখলে অনেকেই চমকে উঠবে। গালে তিন চারদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ির জঙ্গল। মুখখানা শুকিয়ে যেন এতটুকু হয়ে গেছে। ফুলহাতা সোয়েটার তার গায়ে। তার বহু জায়গায় ছেঁড়া এবং কত জায়গায় যে ময়লা লেগেছে তার ঠিক নেই। পরনের প্যান্টটারও সেই একই অবস্থা।

রবার্ট একটা ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরেছে। বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সুশান তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। তার কান্না সহজে থামতে চায় না। কান্নায় তার শরীর দুলে দুলে উঠছে।

রোজিও কান্না চাপতে পারে না। তার চোখও সজল হয়ে ওঠে। সে বাবার গায়ে মাথায় হাত বোলোতে থাকে।

মা এবং মাসীকে ওভাবে ভেঙে পড়তে দেখে টমও কাঁদতে থাকে। তার কান্না থামাবার জন্য রবার্ট ওকে বুকের মাঝে তুলে নেয়।

রবিনসন ভাবতেই পারেনি যে, তার বাবা এত সহজে ফিরে আসবে। সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আনন্দে তার দু' হাত তুলে যেন ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করছে।

—বাবা, তোমার কি হয়েছিল? সুশান জানতে চায়।

রোজি বলে, বাবাকে দেখে ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। আগে একটু বিশ্রাম করতে দে। তারপর সব শোনা যাবে।

রবার্ট, বলে, সত্যি, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। আমাকে একটু ব্র্যান্ডি মিশিয়ে দুধ দে। তারপর আমি শোবো। বড্ড টায়ার্ড লাগছে। হাত পা সব অবশ হয়ে গেছে। শরীরে যেন আর জোর নেই।

রবিনসন এবার সবাইকে তাড়া দেয়। দিদি, বাবাকে দুধের সঙ্গে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে দে। আর সুশান, বাবার বিছানা ঠিক করে দে। এরপর টমের হাতে

ধরে বলে। এসো টম, আমার কাছে এসো। বাগানে গিয়ে রীটার সঙ্গে খেলো।

—দাদু, আমার জন্য টয় ট্রেন আনবে বলেছিল। টম গাল ফুলিয়ে বলে। সেটা আমি এখনো পাইনি।

রবিনসন বলে, এবার তুমি সব পেয়ে যাবে। বিকেলেই তোমার টয় ট্রেন এসে যাবে তা তুমি দেখে নিও।

—থ্যাঙ্ক ইউ! বলে টম দৌড়তে দৌড়তে চলে যায়।

ওদিকে রোজি এবং সুশান কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রবিনসন রিসিভারটা তুলে নিয়ে টমাসকে ডায়াল করে। এনগেজ, দ্বিতীয়বার করতেই লাইন পেয়ে যায়।

—হ্যালো।

—আমায় একটু মিঃ টমাসকে দেবেন।

—উনি একটু আগে অফিসে চলে গেছেন। এখন অফিসে ফোন করুন। ওঁনাকে পেতে পারেন।

—ধন্যবাদ! তবে আমি ওখানে ওঁনাকে ফোন করছি। যদি পাই তো খবরটা আমিই ওঁনাকে জানাচ্ছি। তবু উনি ফিরে এলে বলবেন। রবিনসন গোমসফোন করেছিল। ওঁনার বাবা ও দিদি ফিরে এসেছে। আমি এজন্যই আজ সকালে ওঁনাকে ওদের খোঁজার ব্যাপারে অ্যাপয়েমেণ্ট করেছিলাম। আমি এখন ওঁর অফিসে ফোন করছি।

—ঠিক আছে। আমি ওঁনাকে খবরটা দিয়ে দেবো।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!

রবিনসনের হঠাৎ মনে হয়। এখুনি তো একবার স্থানীয় থানায় ফোন করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে সে থানায় ফোন করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। এরপর বার দুয়েক চেণ্টা করার পর সে লাইন পেয়ে যায়।

অপর পক্ষ ফোন ধরে। হ্যালো।

—আমায় একটু থানার ইন-চার্জকে দেবেন।

—ধরুন। তিনি একটা বাইরের ফোনে কথা বলছেন।

—ঠিক আছে।

—হ্যালো।

—আমি ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—বলছি।

—আমি রবিনসন গোমস্ কথা বলছি। বাবা এবং আমার দিদি এই মাত্র ফিরে এসেছে।

—তাহলে তো সত্যি এটা একটা ভালো খবর। আমাদের আর কিছু করণীয় থাকছে না।

—না। ঠিক আছে। আবার কোন ব্যাপারে দরকার পড়লে আপনার সাহায্য আমি চাইবো।

—যাতে না পড়ে সেটাই আমার কাম্য।

—আপনার এই মনোভাবের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ছাড়ছি।

—হ্যাঁ, ঠিক আছে।

রবিনসন এবার টমাসের অফিসে ফোন করে। একবারের চেষ্টায় লাইন পায় না। বার তিনেক চেষ্টা করার পর লাইন পেয়ে যায়।

—হ্যালো।

—আমায় মিঃ টমাসকে দেবেন।

—ধরুন। উনি কিছু পরীক্ষা করছেন।

—ঠিক আছে।

এরপর মিনিট পাঁচেক অপেক্ষার পর টমাস ফোন ধরে। হ্যালো। টমাস কথা বলছি।

—আমি রবিনসন বলছি। চিনতে পারছেন তো?

—হ্যাঁ। এত সর্ট মেমোরি হলে তো চলবে না।

—আমার বাবা এবং দিদি দু'জনই ফিরে এসেছে।

—এ তো খুবই আনন্দের খবর।

—একটা বিরাট চিন্তার হাত থেকে বাঁচলাম। তাই ভাবলাম, সঙ্গে সঙ্গে খবরটা আপনাকে জানাই।

—খুব ভালো করেছেন। আমি আপনার কেসটার ব্যাপারে আমার সহকারীর সঙ্গে কথা বলবো ভাবছিলাম। যাক্, তার আর কোন দরকার নেই।

—এ ব্যাপারে আপনাকে কিছু দিতে হবে?

—না, না। তার কোন প্রয়োজন নেই। আমি তো এখনো আপনার কাজটা শুরু করিনি।

—ধন্যবাদ। তবে একটা অনুরোধ করবো।

—আমার বোনের বিয়েতে আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে। আমি একটু পরে কার্ড নিয়ে আপনার অফিসে হাজির হচ্ছি।

—আমি যদি এখানে থাকি তাহলে নিশ্চয়ই আসবো।

—ঠিক আছে। ছাড়ছি।

—শুভেচ্ছা রইলো।

—ধন্যবাদ।

—হ্যালো। মিসেস জোহানসন কথা বলছেন?

—হ্যাঁ, হাতের জল ন্যাপকিনে মুছতে মুছতে জোহানসন সায় জানায়। তুমি নিশ্চয়ই রবিনসন কথা বলছো?

—হ্যাঁ। গুড মর্নিং! আপনাকে একটা সুখবর জানাই।

—গুড মর্নিং! সুখবর। তা খবরটা কি?

—আমার বাবা ফিরে এসেছেন।

—এসেছেন? বাঁচালে আমায়। ও'নার জন্য কি চিন্তাটাই না আমার হচ্ছিল। এক সঙ্গে রোজ দু'বেলা আমরা ঘুরতাম। তখন আমাদের মধ্যে কত কথা হতো। এই দু'দিন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। তাতে যে আমার কি খারাপ লাগছে, তা আর তোমায় কি বলবো! এই বয়সে সবকিছু হারিয়ে এটাই তো আমার এখন একমাত্র অবলম্বন।

—তা আমি জানি। সেই জন্যই তো আপনাকে আমি খবরটা জানালাম। ও হ্যাঁ। সন্ধ্যেবেলা আমরা একটা টি-পার্টি'র আয়োজন করেছি বাবার অনারে। আপনি আসবেন।

—নিশ্চয়ই যাবো।

—তখন বাবা তার হারিয়ে যাবার কাহিনী বলবেন।

—তা তোমার বাবার শরীর ভালো আছে তো?

—ভালো আছেন। তবে বড্ড পরিশ্রান্ত।

—হ্যাঁ, তা হওয়াই স্বাভাবিক। কোথায় ছিলেন তার কিছু ঠিক নেই ভালো করে হয়তো খাওয়া-দাওয়া, ঘুম এসব কিছুই হয়নি।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। উনি একটু আগে এসে সামান্য কিছু খেয়েই সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়েছেন।

—হ্যাঁ। ও'নাকে বিশ্রাম নিতে দাও। আর তুমি কি মিঃ স্টিভকে খবরটা জানিয়েছো?

—না, তাকে এখুনি খবরটা জানাচ্ছি, সেই সঙ্গে নেমন্তন্নও করছি রবিনসন জানায়।

—হ্যাঁ, তাই করো। উনি কালই তোমার ব্যাপারে আমার দু'বার ফো করেছিলেন। বড় ভালো মানুষ।

—এই আপনাকে ফোন করার পরই আমি ও'নাকে ফোন করছি।

—ঠিক আছে। আমি ছাড়ছি। সন্ধ্যেবেলা যাচ্ছি।

—আচ্ছা।

এরপর রবিনসন মিঃ স্টিভকেও ফোন করে একই কথা জানায় এবং তা

সন্ধ্যেবেলা তাদের ওখানে যাবার জন্য অনুরোধ করে। তাতে সে রাজী হয়।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। একটু আগে রবার্ট বাগানে টমের সঙ্গে পায়চারি করছিল। এখন সে ঘরে ফিরে আসে। ইতি মধ্যেই হিম পড়তে শুরু করে দিয়েছে। অন্য সময় সে পার্কে বেড়াতে যায়। তখন তার সঙ্গে কয়েকজন সঙ্গী থাকে।

সকালে এবং দুপুরবেলা ঘুমোনোর ফলে রবার্ট এখন খানিকটা সুস্থবোধ করছে। গা-গতরে ব্যাথা আছে। তবে এটা ঠিক আগের থেকে অনেকটা ঝরঝরে লাগছে এবং নিশ্চিন্ত বোধ করছে ফিরে আসতে পেরে।

একটু আগে সূর্য অস্ত গেছে। তার রেশ এখনো পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। একটা লালচে আভা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

আকাশে মেঘ আছে। তার সঙ্গে কিছু হাল্কা মেঘও রয়েছে। ফলে এখন হয়তো বৃষ্টি হবে না। হলেও হয়তো বেশী রাতের দিকে হতে পারে।

সকলের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে বাইরের ঘরটায়। ঘরটা আকারে তেমন বড় না হলেও দশ বারোজন লোক বেশ ভালো ভাবেই বসতে পারে।

প্রথমে এসেছে মিসেস জোহানসন। বয়স প্রায় ষাটের কাছে। চোখে চশমা। সাত বছর তার চোখের ছানি অপারেশন হয়েছে। বয়সের ভারে সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। শরীর-স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো নয়। মাঝে মধ্যে এটা ওটা লেগেই রয়েছে।

মিসেস জোহানসনের পর এসেছে মিঃ স্টিভ। বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি কিন্তু বয়স ততটা দেখায় না। পেটানো স্বাস্থ্য। এককালে এক্সারসাইজ করতো। এখনো সে অভ্যেস বজায় রেখে কিছুট ফ্রি-হ্যাণ্ড করে। তার খাওয়া, শোওয়া, বসা সবই মাপা। ফলে ডাক্তারের দারস্থ তাকে খুব একটা হতে হয় না।

এদের ছাড়া বেশ কয়েকজন পাড়া-পড়সিও এসেছে, কারণ ক'দিন ধরে পাড়ায় এদের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা দারুন আলোড়ন তুলেছে। ফলে অনেকেই এখন উপস্থিত।

সুশানের হবু বর জনের আসার কথা ছিল বিয়ের আগের দিন, কিন্তু সুশানের ফোন পেয়ে সে এখন এখানে উপস্থিত হয়েছে এবং এসে সব ঠিক আছে দেখে সে আসর মাতিয়ে তুলেছে। আর ওকে দেখে সুশানও বেজায় খুশী।

এখন উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে রোজি এবং রবিনসন বসে আছে। একটু পরে রবার্ট এলো। বয়স প্রায় ষাটের কাছে। দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। পরনে নিভাঁজ স্যুট। এটা সে বিয়ের জন্য করিয়েছে। মেয়েরাই পেড়াপেড়ি করে করিয়ে দিয়েছে।

স্যুটে রবার্টকে ভালোই মানিয়েছে। খাটিয়েছে লোক, একটু বয়স হলেও

স্বাস্থ্য ভালোই।

একে একে সবাইকে হুইস্কী সার্ভ করা হলো। সেই সঙ্গে স্নাকসও এবং পরিবেশকে মধুময় করে তোলার জন্য উজ্জ্বল বাতি নিবিয়ে স্বল্প পাওয়ারের আলো জ্বালছে।

সবাই জানার জন্য নানা রকম প্রশ্ন করে বলেছে, রবার্ট তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এখন আবার কৌতূহল চরমে উঠেছে। এবার ঘটনায় আসতে হয়।

সবার মাঝে একটা চেয়ারে বসেছে রবার্ট, যাতে সকলে তাকে দেখতে পায়। সে বলে, এবার আমি ঘটনার কথায় আসছি। তবে কিছু ঘটনার সাক্ষী আমি, কিছু আবার আমার অজান্তে ঘটেছে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা যা দাঁড়ালো তাই আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমার নইলে সত্য কাহিনীতে আসা যাবে না।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটার ঘন্টা পড়তে রবার্ট ঘড়ির দিকে তাকায়। সেই সঙ্গে কিছু অসহিষ্ণু ভাব। না, আর দেরী করা কিছুতেই উচিত হবে না। এর অনেক আগেই তার বেরুনো উচিত ছিল, কিন্তু উচিত কথা তো অনেকই থাকে। পরিস্থিতি যদি অন্য রকম হয় তখন কোন উচিত কখনই খাটে না। যেমন এখন ঘটে চলেছে।

রবার্ট এখন রীতিমতন উত্তেজিত। বহুক্ষণ থেকে সে বাড়ির গাড়ির জন্য অপেক্ষা করে আছে। এই এলো এই এলো করতে করতে বারোটা পর্যন্ত বেজে গেল।

রবার্টের এখন সব রাগ গিয়ে পড়েছে মেয়েদের উপর। রোজির বেরুবার সময় চলে গেল, বাবা যাবো আর আসবো। বেরিয়েছে সেই ন'টার সময়। সাড়ে দশটার বেশী কিছুতেই দেরি হবে না, অথচ এখনো ওদের ফিরবার নামটি পর্যন্ত নেই।

রবার্ট অধৈর্য হয়ে ওঠে। ভাবে, আর বসে থাকা কিছুতেই ঠিক হবে না। কখন থেকে সে তৈরি হয়ে বসে আছে। পরনে প্যান্টের সঙ্গে ফুল হাতার একটা সোয়েটার পরেছে।

রবার্ট মনে মনে বিড় বিড় করতে থাকে। বিয়ের বাজার করতে গেছে তখন সহজে কি আর ফিরবে। তার উপর সব মেয়েরা গেছে—রোজি এবং সুশান।

রবার্ট তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, ওরা একটার পর একটা দোকান ঘুরবে। তারপর বেছে বেছে ঠিক বাজে জিনিষগুলো কিনে নিয়ে আসবে। অথচ ওরা তাকে সঙ্গে নেবে না, কারণ তার পছন্দের সঙ্গে ওদের মিল হয় না। হলে ফ্যাশনের যুগে তার রুচি নাকি একবারে অচল। নিত্য নতুন ফ্যাশনের সঙ্গে তাল রেখে সে নাকি কিছুতেই জিনিস কিনতে পারে না।

রবার্টের মনে পড়ে, এই তো মাস কয়েক আগে সুশানের জন্য সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে একটা কি সুন্দর ফ্রক কিনে নিয়ে এলো। সে ফ্রক দেখে সুশান খুশী হবে তা নয়, ঠোঁট উল্টে মুখ বিকৃত করে বললো, বাবা, এটা কি ঢং এনেছো? আমি তখনই তোমায় বলেছিলাম, এটা কিনতে যেও না।

অথচ রবার্ট ফ্রকটা কেনার আগে দু'চারজনকে দেখিয়েছিল। সবাই তার রুচির প্রশংসা করেছিল। আর সুশান কি না···। সেই থেকে সে আর মেয়েদের কোন ব্যাপারে যেচে নাক গলাতে যায় না। টাকা দিয়েই খালাস।

রবার্ট এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। এক সময় সে পায়চারি থামিয়ে ঘাড় উঁচিয়ে গ্যারেজের দিকে তাকায়। ক্ষীণ আশা, গাড়িটা ফিরেছে কি না। না, গ্যারেজে কোন গাড়ি নেই।

রবার্ট ভাবে, আর দেরি করা ঠিক হবে না। রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে নেবে, কারণ রুটের বাস কম। ফলে দারুণ ভীড় হয়। এ বয়সে এত ভীড় তার আর সহ্য হয় না।

রবার্ট ঘড়ির দিকে তাকায়, বারোটা দশ। আর সে দেরি করতে চায় না। পায়ে সু পরে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

রবার্ট রাস্তার চারদিকে তাকায়। এদিকে বড় একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। গ্রাম্য পরিবেশ তার জন্য দায়ী। মাঝে মধ্যে এক আধটা গাড়ি আসে আর যায়। এখন কতক্ষণ এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে তা কে জানে। আর এখন ট্যাক্সি পেলেও এখান থেকে তার ব্যাঙ্ক যেতে প্রায় একটা বেজে যাবে। রাস্তা তো আর নিহাত কম নয়।

কাজের সুবিধের জন্য এবং নিরাপদ বলে শহরের কাছে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউণ্ট খুলেছে। এখানেই সে বেশী টাকা রাখে। যদিও বাড়ির কাছে ইদানীং গোটা কয়েক ব্যাঙ্ক হয়েছে। তবে সেখানে সে বেশী টাকা রাখে না, অল্প টাকা আছে। যদি বিশেষ জরুরী কোন কাজে টাকা লাগে এই আর কি।

রবার্টের কপাল ভালো, মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পরই দূর থেকে একটা ট্যাক্সি আসতে দেখলো। সেটাকে সে হাতের ইশারায় থামিয়ে নির্দিষ্ট জায়গার নির্দেশ দিয়ে পিছনের সীটে দেহের ভার ছেড়ে দেয়।

রবার্টের সঙ্গে একটা অ্যাটাচি ছিল, অ্যাটাচিটা খালি। এতে করেই সে টাকা নিয়ে আসবে। ভাবে, গাড়িটা সঙ্গে থাকলে তার খুব সুবিধে হতো। তিন লাখ টাকা সে ব্যাঙ্ক থেকে তুলবে। এতগুলো টাকা নিয়ে ট্যাক্সিতে ফেরা মোটেই নিরাপদ নয়। তার উপর সঙ্গে সঙ্গে যে ট্যাক্সি পাবে এমন কোন কথা নয়। ট্যাক্সির জন্য কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তার কোন ঠিক নেই। ট্যাক্সি ফাঁকা পাওয়াই মুশকিল ব্যাপার।

রবার্টের এখনো রাগ যায় না। মনে মনে সে এখনো রোজিদের দোষারোপ

করতে থাকে। যাবার সময় সে পই পই করে বলে দিয়েছিল, সেখানেই কেনা কাটা করতে যাস সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যে ফিরবি। অথচ যাবার সময় ঘাড় কাৎ করে সায় জানিয়েছিল। যতসব আহাম্মকের দল! ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি বিবেচনা থাকে।

রবার্ট প্রথমটা ওদের বারন করেছিল। বলেছিল, তোরা বরং একটা ট্যাক্সি করে যা।

তা শুনে রোজি মুখে বেজার করে বলেছে, ট্যাক্সি এত সহজে পাওয়া যায় নাকি! আর তুমি বাড়ি করলে কি না এই গ্রামে! এখানে কোন জিনিসটা পাওয়া যায়?

—তুইও তো গ্রামেই মানুষ হয়েছিস, আর আমিও তো গ্রামের মানুষ। গ্রাম্য পরিবেশ আমার ভালো লাগে।

—তোমার ভালোলাগা নিয়ে তুমিই থাকো। মোট কথা, এখন আমাদের ট্যাক্সির ভরসায় থাকলে কিছুতেই চলবে না।

—চলবে না? তা অসুবিধেটা কিসে?

—ফেরার সময় হাতে এক গাদা প্যাকেট থাকবে না?

রবার্ট বাইরের দিকে তাকায়। আকাশে মেঘ রয়েছে। ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনো আকাশে যথেষ্ট মেঘ রয়েছে, সূর্যটা মাঝে মাঝে দেখা দিয়েই আবার মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে। ভাবটা এমন, এ সময় যেন তার ফাঁকি দেবার সময়! শুধু কোনরকম দিনটা যেন কাটিয়ে দিতে পারলেই হয়।

উত্তুরে হাওয়ায় একটা ঠাণ্ডা ভাব। ট্যাক্সির খোলা কাঁচ দিয়ে সেই হাওয়া হু হু করে ভেতরে প্রবেশ করছে। ফলে রবার্ট জামার উপরের বোতামটা আটকে দেয়। তাতে সে খানিকটা আরাম বোধ করে।

যাক, এ সময় রবার্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে হাত ঘড়ির দিকে তাকায়। প্রায় পৌনে একটা বাজতে চলেছে। ফলে সে তাড়াতাড়ি ব্যাংকে ঢুকে চেকটা কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে দেয়। পাশাপাশি অনেকগুলো কাউণ্টার। এ কাউণ্টারে ভিড় নেই।

কাউণ্টারের মাঝ বয়সী লোকটি রবার্টের পরিচিত। তাকে দেখে সে একটু হাসলো এবং কুশল প্রশ্নও বিনিময় হলো। তারপর লোকটি চেকটা রিসিভ করে তাকে একটা টোকেন দেয়। টোকেনটা হাতে পেয়ে তাতে একপলক চোখ বুলিয়ে পকেটে রেখে দেয়।

মিনিট কুড়ি বাদে ডাক পড়তে রবার্ট টোকেন কাউণ্টারে এগিয়ে গিয়ে তিন লাখ টাকা গুণে অ্যাটাচিতে রাখে।

রবার্ট টাকাটা অ্যাটাচিতে রাখার পর কাউণ্টারের লোকটি বলে। টাকাটা

ঠিক মত গণে নিয়েছেন ?

—হ্যাঁ, রবার্ট হেসে মাথা দোলায়।

—সাবধানে যাবেন।

—হ্যাঁ সে তো নিশ্চয়ই। দিনকাল মোটেই ভালো নয়, চলি।

—হ্যাঁ, আসুন।

রবার্ট ব্যাংক থেকে যাবার জন্য চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় তার যাওয়া হলো না। ভাবে, একবার এজেণ্টের সঙ্গে দেখা করা বিশেষ দরকার। লোকটার ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন।

এরপর বিয়ের পাট চুকিয়ে কবে আসতে পারবে তার কিছু ঠিক নেই। তাই এসেছে যখন তখন একবার দেখা করে যাওয়াই ভালো।

রবার্ট এজেণ্ট মিঃ ট্রুয়ার্টের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। সে একটা ফাইলের মাঝে ডুবে আছে। আর পেন দিয়ে মাঝে মাঝে খস খস করে কি যেন লিখে চলেছে।

রবার্ট সামান্য হেসে বলে, স্যার, আসতে পারি।

—আসুন, স্টুয়ার্ট ফাইলের উপর থেকে চোখ তুলে রবার্টের দিকে তাকায়। বসুন।

—থ্যাংক ইউ স্যার।

—বলুন, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি।

—স্যার, ঐ লোকটার ব্যাপারে একটু খোঁজ নিতে এসেছি, রবার্ট সামনের গদী আঁটা চেয়ারে বসতে বলে। ভেবেছিল, অ্যাটাচি'টা মেঝেতে রাখে। এরপর কি মনে হতে ওটা কোলের উপর রাখে।

আমি আপনার ব্যালেন্স সীট দেখেছি, মিঃ গোমস্।

—থ্যাংক ইউ স্যার।

কিন্তু লোনটা পেতে আপনার একটু দেরি হবে।

এর অর্থ রবার্ট খুব ভালো করেই বোঝে। অর্থাৎ তাকে কিছু ছাড়তে হবে, আর কিছু না দিলে কোথায়ই বা কাজ হচ্ছে। তখন এরাই বলে, আমরা এসব কাজে কিছু পেয়ে থাকি। অর্থাৎ এটা যেন একটা অলিখিত চুক্তির মত ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে।

তাই রবার্ট একটু হাত কচলে বলে, স্যার, বেশী দেরী হলে খুব অসুবিধেয় পড়ে যাবো। আর আপনারা একটু দয়া না করলে আমরা কোথায় যাই। আপনাদের দয়ার উপর তো আমরা বেঁচে আছি। বলে রবার্ট একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো, যার মানে দাঁড়ায়, স্যার, আপনাদের আমি ঠিক খুশী করে দেবো। শুধু একটু তাড়াতাড়ি লোনটা পাইয়ে দেবেন, এই যা।

—ঠিক আছে, দেখবো কি করা যায়।

—স্যার, আপনি একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। কথা শেষ করেই রবার্ট বলে, স্যার, মেয়ের বিয়েতে যেন যেতে ভুলবেন না।

—আচ্ছা, আচ্ছা, চেষ্টা করবো।

—চেষ্টা নয় স্যার, যেতেই হবে। নইলে বড় দুঃখ পাবো।

—আমার চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না।

—তাহলে স্যার আজ উঠি।

—আসুন।

তারপর রবার্ট স্টুয়ার্টের কামরা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। একটা ট্যাক্সির জন্য সে অপেক্ষা করতে থাকে। দেখতে দেখতে অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল, তবু একটাও ট্যাক্সি পাচ্ছে না। সব প্যাসেনঞ্জারে ভর্তি। ফলে তার একটু আগের ঝিমিয়ে পড়া রাগটা আবার তাকে নতুন করে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে। মনে মনে সে ঠিক করে নেয়, আজ বাড়ি ফিরে সুশানের উপর এক চোট নেবে। এরপর সে ভাবে, ট্যাক্সিটা ওয়েটিং চার্জ দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলেই বুদ্ধিমানের কাজ করতো।

রবার্ট রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপন মনে গর্জাতে থাকে আর ভাবে, এভাবে অ্যাটাচি ভর্তি টাকা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই উচিত নয়। কেউ যদি তার হাত থেকে অ্যাটাচিটা ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হয় তাহলে সে কি করতে পারে। বড় জোর খানিকটা দৌড়ে 'চোর' চোর। বলে চিৎকার করে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে দাঁড়িয়ে থাকবে।

রবার্ট চলন্ত বাসের দিকে তাকায়, বাসেও বেশ ভীড়। আসলে রুটের বাস তো কম। বলতে গেলে এখানে প্রায় সবারই গাড়ি আছে। হতভাগা লোকদের বাসের ভীড়। তাদের সংখ্যাও তো নেহাত কম নয়।

রবার্ট ভাবে, ভীড় বাসে গেলে মন্দ হয় না। তার অ্যাটাচি ভর্তি টাকা খোয়া যাবার ভয় একেবারেই থাকবে না। কারণ বাসে লোক থাকবে। কিন্তু বেচাল দেখলে তারাই বাধা দেবে। এটাই তার কাছে সবচেয়ে নিরাপদ বলে মনে হলো। তবে এ কথা ঠিকই, তার বাসে যেতে কষ্ট হবে। তবু উপায় নেই। তার বাসে যাওয়াই উচিত হবে। কারণ ট্যাক্সিতে গেলে সে সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়বে। সেখানে বিপদে পড়ার সম্ভবনা সবচেয়ে বেশী থাকবে।

রবার্ট বাসে যাওয়ার সপক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি খাড়া করলো। শেষে সপেক্ষাই যুক্তির পাল্লা ভারী হয়ে দাঁড়ায়। শেষে সে বাস স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ায়।

এক সময় রবার্ট বাসে উঠে পড়ে। বাসে ভীড় মন্দ নয়, তবে আগের বাসের তুলনায় ভীড় কিছুটা কম। বাসে উঠেও সে ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে, বাসের সীট পেল না। ফলে তাকে দাঁড়িয়ে যেতে হচ্ছে। কনডাকটার তাকে উঠতে বারণ করেছিল। বলেছিল, বসার সীট পাবেন না, উঠবেন না, তবু তাকে অনুরোধ

ধরে এক রকম জোর করে এ বাসে উঠেছে। হাতে অ্যাটাচি' থাকায় রবার্টের বড় অশান্তি হচ্ছে আর সবচেয়ে বড় কথা, কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা তাকে জানে। করলেই সে গেছে, তার বিপদ কেউ রুখতে পারবে না।

রবার্ট তার অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এভাবে অনেকের অনেক কিছু খোয়া গেছে এবং মাঝে মধ্যে জীবন সংশয় পর্যন্ত দেখা দেয়।

অ্যাটাচি'টা রবার্টের বেশ ভার ভার লাগছে। কারুর হাতে দিতে তার সাহসে কুলচ্ছে না। কার মনে কি আছে তা তো আগে ভাগে জানা যায় না। তার উপর দিনকালের যা অবস্থা। তাছাড়া, আর পাঁচদিন পরে সুশানের বিয়ে। কিছু হলে সে একেবারে পথে বসবে।

দু'একজন রবার্টের অ্যাটাচি' নিতে চাইলো। যারা বসে আছে। এটা নিছক ভদ্রতা, তার উপর তার বয়স হয়েছে।

রবার্ট হেসে এড়িয়ে যায়, না, না, ঠিক আছে। এর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আসলে আমি একটু পরেই নামবো। নিরুপায় হয়ে সে' মিথ্যের আশ্রয় নেয়।

যাক, রবার্ট নিশ্চিন্ত মনে বাস থেকে নামলো। এখান থেকে বাসস্টাণ্ড হাঁটা পথে দশ বারো মিনিট লাগে। ওখান থেকে বাড়ি যেতে আবার কিছু সময় লাগবে। তবু সে রিক্সার দিকে এগিয়ে রিক্সা নিল না। রিক্সাওয়ালাকেও সে এ মুহূর্তে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। কার মনে কি আছে তা তো বলা যায় না।

হঠাৎ রবার্টের কি রকম যেন সন্দেহ হতে থাকে। তার মনে হয় কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে। ফলে সে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকায়। হ্যাঁ, তার অনুমানই ঠিক। সে কিছুটা দূরে তিনটে লোককে দেখতে পেলো। তাকে লক্ষ্য করেই ওরা এগিয়ে আসছে।

রবার্ট ওদের ব্যাংকে দেখেছে বলে আদৌ মনে করতে পারছে না, কিংবা বাসেও দেখেছে কিনা সন্দেহ হচ্ছে। তবে ওরা তার দিকে ওভাবে এগিয়ে আসছে কেন ?

তিনটে লোকেরই ষণ্ডা গুণ্ডা মার্কা চেহারা। বয়স সবারই ত্রিশ পেরিয়ে গেছে। পরণে টেরিকট টেরিলিনের ধোপ দুরস্ত জামা কাপড়। চওড়া গোঁফ জুলপির বাহার। সবারই এক মাথা করে চুল। সেই চুল তেলহীন, রুক্ষ এবং এলোমেলো। সবারই চুল ঘাড় ছাপিয়ে অনেকটা নিচের দিকে নেমে এসেছে। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। পায়ে নতুন আদব-কায়দার পালিশ করা জুতো। অর্থাৎ পোশাক-আশাকে সবাই পুরোপুরি ভদ্রলোক।

ওদের দেখে রবার্টের ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়। সে ভাবে, ওরা তার চেয়ে বয়সে ছোট এবং আকারেও বিরাট। ওদের একটা লোকই তার পক্ষে যথেষ্ট।

দ্বটো লোকের দরকার হবে না।

হঠাৎ রবার্টের মনে হয়, এদের মত দেখতে ছেলেরা মদ খেয়ে নাইট ক্লাব বা বারে গিয়ে টাকার জন্য হামলা করে। ছোরা ছ্বরি চালাতেও বিন্দ্বমাত্র দ্বিধা করে না। এই রকম ছেলেদের ছবি মাঝে মধ্যে সে খবরের কাগজে দেখেছে।

রবার্ট হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। তব্বও সে এক-আধবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে এবং তাকালেই দেখতে পাচ্ছে, ওরা তার দিক থেকে দ্বিট ফিরিয়ে নিয়ে কথার মাঝে ডুবে যাচ্ছে। ভাবটা এমন, যেন ওরা তিনজন বন্ধ্ব। নিজেদের মধ্যে গল্প গ্বজব করতে করতে এগিয়ে চলেছে।

রবার্ট ভাবে, দৌড়াবে? পর ম্বহ্বর্তে সে ভাবে, হ্যাঁ দৌড়বে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটা সে মন থেকে ছেঁটে ফেলে। ওদের সঙ্গে সে দৌড়ে পারবে না। তাছাড়া, এ সময় দৌড়নো মানে তার কাছে যে টাকা বা দামী জিনিস আছে, সেটা ওদের কাছে আরো প্রকাশ হয়ে পড়া। তবে এ কথা ঠিক, ওরা কি না জেনে তার পিছন নিয়েছে নিশ্চয়ই জেনেছে। এটা তার দ্বঢ় ধারণা।

হঠাৎ রবার্টের একটা কথা মনে পড়ে যায়। ঐ মাঝের লোকটাকে বাস থেকে নামবার সময় দেখে থাকবে এবং তাকে বাস থেকে নামবার সময় অন্যকে অন্বরোধ করেছে, বাস থেকে নেমে দাঁড়ানোর জন্য। তখন সে তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, আর এখন সেই লোক কি, না তার সামনে সাক্ষাৎ ম্বত্যু দ্বত হিসেবে দাঁড়িয়েছে। একই মান্বষের দ্বটো র্বপ। সে ভাবতে পারে না।

রবার্ট জানে, এ অঞ্চলে একটা থানা আছে। সে ব্যবসায়ী মান্বষ। এ রকম অনেক খবর তার জানতে হয়। হাঁটা পথে এখান থেকে মিনিট দ্বয়েক সময় লাগে।

রবার্ট ভাবে, এতটা পথ দৌড়নো তার পক্ষে কিছ্বতেই সম্ভব নয়। যদি কোনদিন বলে লাথি মারতো, তব্ব একটা কথা ছিল, আর এ বয়সে দৌড়নো মানে যেচে নিজের বিপদ ডেকে আনা।

রবার্ট পিছন ফিরে দেখে, ওদের এবং আমার মধ্যে দ্বরত্ব অনেকটা কমে এসেছে আর একটু হলেই ওরা তাকে ধরে ফেলবে। তার থানায় ঢুকবার মতলব থাকলেও তা হয়তো সম্ভব হবে না।

রবার্ট অসহায় ভাবে রাস্তার এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। যদি তার পরিচিত কেউ বের হয়। যাদের দেখছে সংখ্যায় তারা খ্বই কম এবং এদের কোনদিন দেখেছে বলেও তার মনে পড়ে না। এদের কাউকে ডাকলে সেও যে তার উপর সদয় হবে, তার কি মানে আছে! আর সময় যখন খারাপ হয় তখন একটার পর একটা বিপদ আসতে থাকে। সোনা ধরলেও ছাই হয়ে যায়।

হঠাৎ রবার্টের চোখের সামনে স্বপ্নানের ম্বখখানা ভেসে ওঠে। ভাবে, ওর

যে পাঁচদিন পরে বিয়ে। এ টাকা যেমন ওর বিয়ের পার্টিতে খরচ হবে, তেমন বাড়ি মেরামত এবং অনেক কিছু কেনার আছে।

রবার্ট আর কিছু ভাবতে পারে না। তার চোখে প্রায় জল এসে যায়। তবু ভাবনা দূর হয় না। ভাবে, এতগুলো টাকার দাম তার কাছে অনেক। তার বহুদিনের সঞ্চিত টাকা। এভাবে সে কখনই নষ্ট হতে দিতে পারে না।

তারপর রবার্ট জানে না, কখন সে দৌড়ুতে শুরু করেছে। দৌড়চ্ছে আর পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। ফলে তার দৌড় আস্তে হয়ে যাচ্ছে। আর হাঁপাচ্ছে। তার বুক হাঁপরের মত ওঠা নামা করতে থাকে। সে যেন আর পারছে না। তবু সে মরিয়া হয়ে দৌড়তে থাকে। দৌড়বার মধ্যেই যেন তার বেঁচে থাকার মূল মন্ত্র লেখা আছে। কষ্ট হচ্ছে, তবু সে নিরুপায়।

রবার্টকে দৌড়তে দেখে ওরাও দৌড়তে আরম্ভ করে। তবে রবার্টের সঙ্গে প্রথম থেকেই ওদের ব্যবধান অনেকটা ছিল, কারণ একই সাথে বাস থেকে নেমে পিছু নিলে ওর সন্দেহ হতে পারে। তাই ওরা বাস থেকে নেমে ওকে খানিকটা এগিয়ে যেতে দিয়েছে, তারপর ওরা তার পিছু নিয়েছে।

তারপর রবার্ট এক সময় ঐ থানায় ঢুকে পড়ে।

রবার্ট এক কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস জোহানসন বললো, যাক্, তাহলে তো বিপদের হাত থেকে রেহাই পেলেন?

—মোটেই না, রবার্ট জানায়। তাতে উল্টে আমার বিপদ বেড়েছে?

—বেড়েছে কেন? আপনি তো থানায় ঢুকে পড়তে পেরেছিলেন।

—ওটা তো আমায় বিপদে টেনে আনলো।

—আমি আপনার কথা আদৌ বুঝতে পারছি না।

—এর পরের কথা শুনুন তাহলেই আমার কথার মানে আপনি বুঝতে পারবেন।

—ঠিক আছে, বলে যান।

ওদিকে ঘড়িতে কাঁটাটা সাতটার দিকে এগিয়ে চলেছে। মাঝে একবার ঝড় উঠলো। ঠাণ্ডা হাওয়া দিল। বৃষ্টি নামে মাত্র হলো। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আর হলো না। তবে হাওয়ায় সে মেঘ কাটেনি। এখনো তা রয়ে গেছে। পরে হয়তো বৃষ্টি হতে পারে। এটা হয়তো তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

উপস্থিত অথিতিদের মধ্যে থেকে মিঃ স্টিভ বলে ওঠে, মিঃ রবার্ট, আপনার কাহিনী আবার শুরু করুন। আমি বেশ উত্তেজনাবোধ করছি, অনেকটা রহস্য গল্পের মতন।

রবার্ট হেসে বলে, বলছি। তার আগে এক রাউণ্ড করে কফি হলে কেমন হবে?

—ভালোই হবে। রবার্টের কথায় অনেকেই সায় জানায়।

একটু পরেই সুশান এবং রোজি সবাইকে কফি পরিবেশন করতে থাকে। ওদের সঙ্গে জনও হাত লাগায়।

কফি পানের পাট চুকতে রবার্ট আবার তার কাহিনী শুরু করে—

রবার্ট থানায় প্রবেশ করে ভাবে, যাক্ বাবা। এবার পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন ছুঁচোগুলো পালাতে পথ পাবে না। আর সে ভাবছে, এতটা পথ সে দৌড়লো কি করে। এ স্বয়ং গুরুদেবের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই না। তারপর সে মনে মনে ঠিক করে নেয়, সুশানের বিয়ের পরই সারেতে গিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে আসবে।

ওদিকে রবার্টের ধারণা যে কত ভুল তা প্রমাণিত হতে দেরী হয় না। ওরাও বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে থানায় ঢোকে। ওদের চোখে মুখে একরাশ বিরক্তি ফুটে উঠেছে। ওদের মধ্যে একজন উত্তেজিতভাবে বলে, আমরা থানার ও. সি.-র সঙ্গে দেখা করতে চাই। বলে সে কর্তব্যরত একজন সেপাইয়ের দিকে তাকায়।

সেপাই জানতে চায়, কেন? কি ব্যাপার?

—দরকার আছে। উনি কোথায়?

—চেম্বারে আছে।

কিন্তু রবার্ট কোন কথা বলছে না। সে অল্প অল্প ঘামছে। যদিও এ আবহাওয়ায় ঘামা উচিত নয়। তবু সে উত্তেজনা এবং ভয়ে তার এ অবস্থা হয়েছে, আর সে অবাক হয়ে ভাবছে, ওরা থানার অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে কোন সাহসে! ওদের বুকের পাটা আছে বলতে হবে।

এ কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা ভেবে রবার্টের বুক ভয়ে কাঁপতে থাকে। ভাবে, ওরা থানার অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে কেন? এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে? তবে উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন এবং সেটা যে শুভ নয়, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং তার বিপদ আদৌ কাটেনি। তবে সান্ত্বনা এই যে, এখানে এসে ওরা তেমন সুবিধা করতে পারবে না। থানা বলে কথা। বেশী বাড়াবাড়ি করলে লকাপে পুরে দেবে।

তবে আর একটা কথা ভেবে রবার্টের বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবার উপক্রম হয়। ভাবে ঐ লোকগুলো এক একটা গুণ্ডা বদমাইস। এদের অসাধ্য কোন কাজ নেই। সেই সঙ্গে আছে প্রচণ্ড মনোবল। নইলে এভাবে কখনো থানায় ঢুকতে পারতো না। এদের সঙ্গে পুলিশ মহলে দহরম-মহরম থাকে। থানা অফিসার তো কোন ছাই। নইলে এরা অবাধে কেমন করে অসমাজিক কাজ গুলো চালিয়ে যায়।

রবার্ট এধরণের অনেক কথা শুনেছে। তাই সে ভালোর চেয়ে খারাপটা আগে ভাবে। যদি তার ক্ষেত্রে এ রকম কিছু ঘটে তাহলে সে গেছে। ক'দিন

পরেই সুশানের বিয়ে। বাড়িতে কত অতিথি আসবে। এছাড়া, অন্য অনেক খরচাও আছে। সেই সব ভেবেই সে ব্যাঙ্ক থেকে এতগুলো টাকা তুলেছে।

রবার্ট আর ভাববার অবসর পায় না। সে অ্যাটাচি'টা বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নেয়। সেই সঙ্গে তার চিন্তায় ছেদ পড়ে। পড়তে বাধ্য। ওদের দিকে সে তাকিয়ে থাকে।

ওদের মধ্যে একটা লোক বলে, আমরা ইন চার্জে'র সঙ্গে দেখা করতে চাই। ভীষণ জরুরী ব্যাপার।

কর্তব্যরত পুলিশটি বলে, এখন দেখা হবে না।

—দেখা হবে না? কেন? কারণটা জানতে পারি কি?

—উনি এখন খুব ব্যস্ত আছেন।

—ব্যস্ত আছেন? কথার মধ্যে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে লোকটা।

—হ্যাঁ, পুলিশটি মাথা নাড়ে।

—আমরাও খুব ব্যস্ত আছি, আর আমাদের ব্যাপারটা যে খুবই জরুরী সে কথা একটু আগেই আপনাকে বলেছি। কথা শেষ করে লোকটা একটা দশ টাকার নোট পকেট থেকে বের করে ভাঁজ করে পুলিশটার হাতে গুঁজে দেয়।

পুলিশটার এবার কথা বলার সুরই পাল্টে যায়। দেখি, স্যার এখন ব্যস্ত আছেন কি না।

— দরকার থাকলেও বলবেন আমাদের ব্যাপারটা খুবই জরুরী।

—বলবো, বলে পুলিশটি আর দাঁড়ায় না। তবে যাবার আগে নোটটা পকেটে চালান করে দিয়েছে।

রবার্ট এসব দেখে আরো ঘামছে। ভাবে, কার কাছে সে অভিযোগ জানাতে এসেছে! এর চেলা যদি এমন হয় তবে গুরুটি কেমন হবে? হয়তো এর চেয়েও বাড়া। তা হলেই সে গেছে। তবে এমন নাও হতে পারে। এখন একমাত্র ঠাকুর ভরসা। ভগবানই তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। সেই সঙ্গে সে মনে মনে গুরুদেবের নাম করতে থাকে।

এর মিনিট খানেক পরে পুলিশটি সাহেবের চেম্বার থেকে ঘুরে এসে তাদের বলে, স্যার ডাকছেন।

— থ্যাঙ্ক ইউ! একজন বলে ওঠে।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রবার্ট বলে, আমিও সাহেবের চেম্বারে যেতে চাই।

—যেতে চান? পুলিশটি কটমট করে রবার্টের দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ, রবার্ট মাথা নাড়ে।

— তা হবে না। এরা যাবে।

—ভাই, একবার, রবার্ট কাতরভাবে বলে। বলেই ভাবে, এখন টাকা দিয়ে

কাজ হবে না। কারণ ও অপর পক্ষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বসে আছে। তার উপর ওরা সামনেই রয়েছে। না থাকলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। তাহলে ঠিক নিয়ে নিত।

—হবে না, তারপর পুলিশটি ওদের দিকে তাকিয়ে বলে। আপনারা সাহেবের চেম্বারে যান।

এ কথা পুলিশটি বলার সঙ্গে সঙ্গে ওরা এক সঙ্গে মার্শালের ঘরে ঢুকে পড়ে। মার্শাল এখন এখানকার চার্জে রয়েছে? ছোট থানা। জেমসও এ থানার আর একজন ইন-চার্জ। সে একটা বিশেষ জরুরী কাজে গেছে বলে মার্শালকেই এখন থানার সব কিছু দেখতে হচ্ছে। ওর ফিরতে প্রায় দিন দুয়েক লেগে যাবে। এটা ওর মার্শালের কাছ থেকে ম্যানেজ করা ছুটি। এরকম ছুটি মার্শালও নিয়ে থাকে।

থানার সামনে কিছুটা ফাঁকা জমিতে গাছ গাছালির জটলা। কয়েকটা বড় গাছও আছে। এরই মাঝে থানা।

মার্শালের বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে। পেটানো স্বাস্থ্য। মাথায় প্রায় দু' ফুটের মত লম্বা হবে। চওড়া কপাল। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা।

ওদের মধ্যে একজন মার্শালের দিকে তাকিয়ে বলে, এইমাত্র থানার মধ্যে একটা লোক ঢুকেছে। স্যার, এখুনি ওকে আপনি অ্যারেস্ট করুন।

—অ্যারেস্ট করবো? মার্শাল লোকটার দিকে তাকায়। কেন? ওর বিরুদ্ধে আপনার চার্জ কি?

— বলছি স্যার। আগে লোকটাকে এখানে ডাকুন, তারপর আপনাকে খুলে বলছি। ও পালিয়ে গেলে আমরা পথে বসবো।

মার্শাল সঙ্গে সঙ্গে বেল বাজায়। বেলের শব্দ শুনে ঐ পুলিশটা ওর চেম্বারে হাজির হয়। স্যার, কিছু আছেন?

—হ্যাঁ। এইমাত্র থানায় কোন লোক এসে ঢুকেছে?

—হ্যাঁ, স্যার।

—তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

— এখুনি নিয়ে আসছি স্যার, পুলিশটা মার্শালের চেম্বার থেকে বেরিয়ে রবার্টের কাছে এসে বলে। স্যার, এখুনি আপনাকে চেম্বারে ডাকছে।

রবার্ট কোন কথা বলে না। এ রকম বলির পাঠার মত কাঁপতে কাঁপতে সুইং ডোর ঠেলে মার্শালের ঘরে প্রবেশ করে।

মার্শাল রবার্টের দিকে তাকায়। তারপর সে রবার্টের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে বলে, এর কথা আপনারা আমায় বলছিলেন, না অন্য কেউ?

—না স্যার, এই।

— এর বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ কি ?

—এই লোকটা আমাদের হাত থেকে অ্যাটাচি ছিনিয়ে নিয়ে থানায় ঢুকে পড়েছে। এই অ্যাটাচি'টা আমাদের।

—অ্যাটাচি'টা আপনাদের ? মার্শালের কি রকম যেন ওদের উপর সন্দেহ হতে থাকে।

—হ্যাঁ স্যার।

রবার্ট কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বাধা পায়। ফলে তার কথা বলা হয় না। না বলতে পেরে সে দারুণ অস্বস্তিবোধ করতে থাকে।

মার্শাল রবার্টকে বলে, আগে ওদের কথা শুনি। ওরা কি বলতে চায় দেখি। তারপর আমি আপনার কথা শুনছি।

এবার মার্শাল রবার্টের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে বলে। আপনারা তিন জন থাকা সত্ত্বেও ?

—আসলে অ্যাটাচি'টা আমার হাতে ছিল। উনি হঠাৎই টান মেরে থানায় ঢুকে পড়েছেন, আমরা এখন প্রায় থানার কাছে চলে এসেছিলাম। নইলে ঠিক আমরা ধরে ফেলতাম।

একটু থেমে লোকটা আবার বলে। স্যার, আমার কথা বিশ্বাস না হয় আমার বন্ধুদের আপনি জিজ্ঞাস করুন।

—আপনার বন্ধুদের আমি পরে জিজ্ঞাস করছি, মার্শাল মাথা নেড়ে কথা বলে। তাহলে উনি হঠাৎই টান মেরেছেন ?

—হ্যাঁ স্যার।

—রবার্ট আর চুপ করে থাকতে পারে না। সে প্রায় মরিয়া হয়ে বলে। স্যার, মিথ্যে কথা বলছে। অ্যাটাচি'টা আমার। আমি অ্যাটাচি'টা কেন টান মারতে যাবো ?

মার্শাল এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে একটু রাগতভাবে বলে, আমি আপনাকে কথা বলতে বলেছি ?

— স্যার, ওরা আমার নামে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলছে। তাই আর চুপ করে থাকতে পারছি না।

—তবু আপনি এখন চুপ করুন। যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবো তখন আপনি তার উত্তর দেবেন।

—স্যার...... ।

—যা বলছি তাই শুনুন।

এবার মার্শাল সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে, তা অ্যাটাচি'টা আপনার, তাই না ?

—হ্যাঁ স্যার।

—অ্যাটাচির্তে কি আছে ?

—টাকা আছে।

—কত টাকা আছে ?

—তিন লাখ টাকা।

—তিন লাখ টাকা ? টাকার অংকের পরিমান শুনে মার্শালের চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

—হ্যাঁ স্যার।

—এত টাকা অ্যাটাচির্তে কোথেকে এলো ?

—স্যার, একটু আগে ব্যাংক থেকে তুলেছি।

—কোন ব্যাংক থেকে তুলেছেন ?

—গ্রিনলেজ ব্যাংক থেকে।

—কোন শাখার ?

—এডওয়ার্ড রোডের।

—অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা কত ?

—স্যার, আমাদের ব্যবসা। আমাদের তো একটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট নয়। তাই এই মুহূর্তে ঠিক কোন অ্যাকাউন্ট থেকে তুলেছি, তা বলতে পারছি না।

—পারবেন না ?

—না স্যার। তবে……।

—তবে কি ?

—আমাদের একটু সময় দিলে একটু পরে এসে জানিয়ে যেতে পারি।

—পরে এসো ! উহুঁ, তা সম্ভব নয়। আচ্ছা অন্তত, একটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার বলুন।

—স্যার, ঠিক মনে করতে পারছি না।

রবার্ট নিজের অজান্তেই একটু উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে বলে, স্যার, ওরা পারবেও না। টাকা আমার। এই মাত্র ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে এসেছি, আর পাঁচদিন পরে আমার মেয়ের বিয়ে।

এবার মার্শাল রবার্টের দিকে তাকিয়ে কিছুটা শান্তভাবে বলে, বলেছি তো আমি আপনার কথা শুনছি। শুধু একটু ধৈর্য ধরে দয়া করে অপেক্ষা করুন।

মার্শাল ওদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে ওঠে, টাকা তোমাদের না হয়ে কিছুতেই যায় না। তোমাদের চেহারাই তাই বলছে। আর তোমরা ব্যবসা করো ঠিকই, তবে সে ব্যবসা করো লোকচক্ষুর আড়ালে মাঝ রাতের অন্ধকারে।

এ কথা বলা চলে না। তাই মার্শাল বলে, তা নোটের বাণ্ডিলগুলো কত

টাকার তা কি আপনাদের মনে আছে ?

—হ্যাঁ আছে।

—কত টাকার ? মার্শাল জানতে চায়।

—স্যার, একশো টাকার।

—আর একজন বলে স্যার, ওর কথা সত্যি না মিথ্যে আপনি এখুনি অ্যাটাচি খুলে দেখতে পারেন।

—অপর একজন বলে স্যার, এই টাকা তোলার জন্য ব্যাংকে নোটিশ পর্যন্ত আমরা দিয়েছি। আপনি এখুনি ব্যাংকে ফোন করে এ কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন।

রবার্ট আর চুপ করে থাকতে পারে না। রাগে দুঃখে এবং কিছুটা উত্তেজিতভাবে বলে, স্যার, ওদের কথা আপনি একবারে বিশ্বাস করবেন না। ওরা সব মিথ্যে কথা বলছে।

—মিথ্যে ? সেই লোকটা বলে। স্যার, একটা কথা বলবো ?

—বলো ? মার্শাল মাথা নাড়ে।

—আমাদের মনে পাপ থাকলে কখনো এভাবে থানায় ঢুকতে পারি ?

—পাপ ? মার্শাল মনে মনে হাসে।

—হ্যাঁ স্যার, লোকটা তার কথায় বেশ জোর দিয়ে বলে।

—ওদিকে রবার্ট একটা কথা না ভেবে পারছে না। তার অ্যাটাচিতে কত টাকা আছে তা তো বললোই, এমন কি কত টাকার বাণ্ডিল আছে, তাও নির্ভুল ভাবে বললো। তাহলে ওরা ব্যাংকে ছিল। তাকে টাকা তুলতে দেখেছে এবং ওখান থেকেই তাকে ওরা অনুসরণ করেছে।

মার্শাল বুঝতে পারে, রবার্টের কথাই ঠিক। তাই সে বলে ঠিক আছে। যে ব্যাংক থেকে আপনারা টাকা তুলেছেন, সবাই আমরা এক সঙ্গে সেই ব্যাংকে চলুন। তাহলেই বোঝা যাবে টাকাটা প্রকৃত কার।

মার্শাল জানে, এ কথায় কাজ হবে। করণ সে এই লাইনে বহুদিন আছে। কোন রোগের কোন ওষুধ তা সে বেশ ভালো করেই জানে। শুধু ঠিক মত প্রয়োগ করতে পারলেই হলো।

সত্যি, তাতেই কাজ হলো। তবু ঐ তিনজনের মধ্যে একজন গলা চড়িয়ে বলে উঠলো, স্যার, আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না ?

মার্শাল সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলে, টাকার দাবী জোরদার করতে হলে আপনাদের আমার সঙ্গে ব্যাংকে যেতে হবে। এতগুলো টাকা বলে কথা। দু, পাঁচশো হলে তবু একটা কথা ছিল। তাই বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

রবার্ট মার্শালের দিকে তাকিয়ে বলে। স্যার, আমি একটা কথা বলতে

চাই।

—বলুন কি কথা আপনি বলতে চান?

—স্যার, আমি যেতে রাজী আছি।

—আপনি রাজী?

—হ্যাঁ স্যার।

—আর আপনারা? মার্শাল রবার্টের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকায়।

একে অপরের দিকে চোখ চাওয়া চাওয়ি করলো। তারপর একজন কিছুটা নরম গলায় বলে, স্যার, আপনার সঙ্গে আমাদের ব্যাংকে যেতে অসুবিধে আছে।

—অসুবিধে আছে? কেন? কারণটা জানতে পারি কি?

—স্যার, বুঝতেই তো পারছেন, আমরা ব্যবসা করি। ব্ল্যাকমানির ব্যাপারে কেন খুঁচিয়ে ঘা করতে যাই।

মার্শাল সহসা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তার ইচ্ছে করছে এই ঠগ জোচ্চোর গুলোকে লকআপে পুরে রাখতে। এরপর সে বলে, আশাকরি এখন আপনারা চলে যাবেন। আর টাকাটা যে আপনাদের নয় তা আমার বুঝতে কোনই অসুবিধে হচ্ছে না।

তিনজনে একে অপরের মুখের দিকে তাকায়। বুঝতে পারে যে, তারা ধরা পড়ে গেছে। আর এখান থেকে এখন মানে মানে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের মত কাজ। নইলে হয়তো কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে এবং এখান থেকে সরে পড়তে না পারলে আবার কোন কেসে জড়িয়ে পড়বে তা কে জানে। সে ব্যাপারে এরা তো সিদ্ধহস্ত। একটা কেস থেকে আর একটা কেসে জড়িয়ে দেয়।

তারপর একজন একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও বলে। স্যার, আমাদের পক্ষে ব্যাংকে যাবার সত্যি অসুবিধে আছে।

মার্শাল তাহলে আমি আপনাদের জন্য কিছু করতে পারছি না।

—ঠিক আছে। আমরা দেখে নেবো।

—নেবেই বই কি! বলেই মার্শাল পুলিশী মেজাজে গর্জে ওঠে। ফের যদি কোনদিন থানা চত্তরে দেখি তো চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দেবো। কথাটা যেন মনে রাখবি।

এরপর ওরা চলে যেতে রবার্ট বলে, স্যার, এ যাত্রা আপনার জন্যই রক্ষা পেলাম। সত্যি, আপনাকে যে আমি কি বলে ধন্যবাদ দেবো……।

মার্শাল রবার্টকে চেয়ারে বসতে বলে, না, না, এতে ধন্যবাদের কি আছে! এতো আমাদের ডিউটি।

রবার্ট চেয়ারে বসতে পেরে যেন বাঁচলো। তার উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। সে বলে, স্যার, ডিউটি তো সবারই কিছু না কিছু থাকে, কিন্তু আমরা ক'জনে তা পালন করি।

—তা অবশ্য বলতে পারেন।

—আপনি না থাকলে আমার এতগুলো টাকা যেত।

—এত টাকা নিয়ে ট্যাক্সি করে বাড়ি যেতে পারবেন।

আজকাল দিন কালের যা অবস্থা তাতে এ ভাবে কেউ রিস্ক নেয়। বরাত ভালো তাই বেঁচে গেলেন।

—তা স্যার, একশোবার। বাড়ির গাড়ি করেই যেতাম। হঠাৎ মেয়েরা বিয়ের বাজার করতে গিয়ে গাড়িটা আটকে ফেললো। ফলে এই বিপত্তি। কপালে দুর্ভোগ থাকলে কে ঠেকাবে বলুন! নইলে ওদের গাড়ি নিয়ে এত দেরী করার কথা নয়।

—হ্যাঁ, কপাল মন্দ হলে পরিবেশও ঠিক সেইভাবে তৈরি হয়ে ওঠে। মার্শালও রবার্টের কথায় সায় জানিয়ে বলে।

—তা যা বলেছেন।

—আপনি কি করেন?

—ক্ষেত-খামার আছে। তবে খুবই সামান্য।

—সামান্য হলে কি আর এতগুলো টাকা এক সঙ্গে তুলতে পারতেন!

—স্যার, ঐ আপনাদের বাবা-মার আশীর্বাদে……।

—তা আপনি কোথায় থাকেন?

রবার্ট কোথায় থাকে তা জানিয়ে ভাবে, স্যারকে কিছু টাকা দেওয়া দরকার। তার এতবড় উপকার করেছে। আর এরা তো সব সময় কিছু নেবার জন্য ওৎ পেতে থাকে। তবে ব্যতিক্রম যে একবারে নেই তা নয়। তবে তা সংখ্যায় এত নগণ্য যে গুণতিতে আসে না। আর কেই বা বাহবা পাবার জন্য শুধু নজীর সৃষ্টি করতে চায়। তার চেয়ে সবার পকেট ভর্তি করার দিকে নজর। তবে এ ক্ষেত্রে ঠিক ঘুষ নেওয়া বলা চলবে না। সে স্বেচ্ছায় খুশী হয়ে দিতে চাইছে।

তাই রবার্ট হাত কচলে বলে, স্যার, অভয় দেন তো একটা কথা বলি।

—কি কথা? মার্শাল জানতে চায়।

—স্যার, আমি সামান্য কিছু আপনার ছেলে মেয়েদের মিষ্টি খাবার জন্য দিতে চাই।

—না, না, তার কোন প্রয়োজন নেই। মার্শাল প্রবলভাবে বাধা দেয়।

—স্যার, এ কথা বললে কি হয়! রবার্ট মার্শালের কথায় খুশী হয়। এরপর সে বিগলিত ভাবে বলে, আপনি আমার এত বড় উপকার করেছেন, আর

আপনাকে তো দিচ্ছি, না। দিতে চাই আপনার ছেলে মেয়েদের। স্যার, আপনি 'না' বলবেন না।

মার্শালের সেই এক কথা। বলে, আপনি একটা শুভ কাজের জন্য টাকাটা নিয়ে যাচ্ছেন। ও থেকে কিছু নিতে আমায় দয়া করে আপনি বলবেন না। বরং আপনি আমায় আপনার মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করবেন। গিয়ে পেট ভরে খেয়ে আসবো।

—স্যার, সে তো আপনাকে যেতেই হবে। না গেলে আমি কিছুতেই শুনছি না।

ওদিকে দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। হাওয়ায় একটা ঠাণ্ডা ভাব। আকাশের মেঘের আনাগোনা। হয়তো বৃষ্টি হতে পারে। এ বোধহয় তারই ইঙ্গিত।

একটু পরে সূর্য অস্ত গেল। আস্তে আস্তে আকাশের চারিদিকে অন্ধকার ভাব ফুটে উঠেছে, আর মেঘ থাকায় সন্ধ্যে যেন আরো তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসছে।

—রবার্ট আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে, আর দেরি করা মোটেই উচিত হবে না। একেই তার অনেক দেরি হয়ে গেছে। এতেই বাড়ির লোকেরা কত কি চিন্তা করছে তার ঠিক নেই। তার টাকা নিয়ে বেলাবেলি ফেরার কথা ছিল, আর এখন কিনা...... ।

তাই রবার্ট বলে, স্যার, এবার তাহলে উঠি। আর কাল এসে কার্ড দিয়ে আপনাকে নেমন্তন্ন করে যাবো।

—যাবেন? মার্শাল রবার্টের দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ স্যার। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। গিয়েই আবার ছুটতে হবে।

—কিন্তু আমি বলছিলাম...... ।

—কি বলছিলেন?

—আপনার এখন একা না যাওয়াই উচিত।

—কেন স্যার, রবার্ট একটু ভয় পেয়ে যায়। এ কথা কেন বলছেন?

—ঐ শয়তানগুলোর কথা ভেবেই আপনাকে আমি একথা বলছি। ভাবছেন ওরা চলে গেছে?

—যায় নি? রবার্টের আতঙ্কিত মুখ।

—না, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওরা আশে পাশে কোথাও ঘাপটি পেতে বসে আছে।

—বলেন কি! রবার্ট বেশ ভয় পেয়ে যায়।

—আমার অভিজ্ঞতা থেকেই আপনাকে এ কথা বলছি, কারণ এ ধরনের বহু

ঘটনার সাক্ষী আমি এবং এর জন্য অনেককে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়েছে। সে সব মর্মান্তিক ঘটনা।

—থানা চত্ত্বরে এসব ঘটতে পারে?

—তা হয়তো হবে না। একটু দূরে গেলেই ঘটবে। এর আগের ঘটনাগুলোও তাই ঘটেছিল।

—আপনার কথা শুনে আমার তো প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, যাবার মতই কথা। তার উপর আপনার সঙ্গে এতগুলো টাকা রয়েছে।

—সেই জন্যই তো আরো চিন্তা হচ্ছে।

—তাহলে এখন কি করতে বলছেন?

—আমি ঐ লোকগুলোর কথা ভেবেই বলছি। ওদের সাহসেরও বলিহারি। একবারে থানায় পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিল। দাগী আসামীরা থানাপুলিশকে ভয় পায় না। ওরা কাজ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত সব কিছু করতে পারে। কোন কিছুর জন্য পিছ-পা পর্যন্ত হয় না।

রবার্ট ভয়ের সঙ্গে বলে, তাহলে এখন কি করা দরকার?

মার্শাল রবার্টের কথার উত্তর দেবার সময় পায় না। সহসা ফোনটা বেজে উঠতে সে রিসিভার তুলে নেয়। হ্যাঁ বলছি, না, এখনো কোন খবর আসেনি। এলে জানাবো। নমস্কার।

মার্শাল রবার্টের দিকে তাকিয়ে বলে। হ্যাঁ কি যেন বলছিলেন?

—এখন ভাবছি, কি ভাবে ফেরা যায়। গাড়িটা সঙ্গে থাকলে আমায় এসব ঝামেলায় আদৌ পড়তে হতো না।

—তা তো ঠিকই। আপনি বরং একটু অপেক্ষা করুন। থানার ভ্যানটা এখুনই আসার কথা আছে। এলে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেখন। এছাড়া, আমি কোন উপায় দেখছি না।

—তাহলে তো স্যার, খুবই ভালো হয়, রবার্ট এক গাল হেসে বলে। এরপর মার্শালকে খুশী করার জন্য সে বলে। অথচ আমরা আপনাদের কত বদনাম দিই। আপনাদের মত দু'চারজন লোক এখনো আছে বলে আমরা আজো টিকে আছি।

মার্শালের মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে ওঠে। তারপর সে বেল বাজাতে একজন সেপাই ঘরে ঢুকতে সে বলে। জর্জ, আমাদের চা দিয়ে যাও।

—জী স্যার, বলে জর্জ ঘরের পর্দা ঠেলে চলে যায়।

রবার্ট বেজায় খুশী। তবু সে কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, স্যার, আবার কেন চায়ের ঝামেলায় গেলেন।

—না, না, এতে ঝামেলার কি আছে! আমি খেতাম। সে সঙ্গে আপনিও

একটু খাবেন, এই আর কি।

—আপনাকে যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। সত্যি, আপনাকে যে আমি কি বলে প্রশংসা করবো, তা বুঝতে পারছি না, আর ব্যবসা তো কমদিন করছি না, কিন্তু পুলিশ লাইনে আপনার মতন অমায়িক ব্যবহারের লোক আমি খুব কমই দেখেছি।

তারপর চা এলো। দু'জনে মিলে চা খেলো। চা পান শেষ হতে মার্শাল দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায়, সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি আছে। ভাবে, কোথায় পুলিশ ভ্যান। কখন আসবে তার কিছু ঠিক নেই। এত দেরি হবে জানলে……। অথচ অন্য কোন উপায়ও সে দেখছে না। এতক্ষণে সে বাড়ি গিয়ে অনেক কাজ করে ফেলতে পারতো। আবার সে মার্শালের কথা ঠেলতেও পারছে না। এত দেরি হবে তা সে আদৌ ভাবতে পারেনি। ফলে তাকে খুব চিন্তিত দেখাতে থাকে।

ঝিঁ ঝিঁ পোকার এক টানা ডাক শোনা যাচ্ছে। দু'একটা জোনাকি উড়ে এসে ঘরে বসলো। তারপর পোকাগুলো অন্ধকারের মাঝে মিশে যায়।

খোলা জানলা পথে বাইরের খানিকটা অংশ চোখে পড়ে।

আকাশে বোধহয় বেশ ভালোই মেঘ করেছে। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। সেই বাতাস বড় বড় গাছগুলোতে এসে ধাক্কা মারছে। ফলে একটা আওয়াজ তুলছে।

গাড়ির আওয়াজ মাঝে মধ্যে ভেসে আসছে। লোকজনের চলাচল অনেক কমে গেছে। পান বিড়ির দোকানের সামনে কিছু লোকের জটলা রাত আরো বাড়ছে।

রবার্ট উসখুস করতে থাকে। তারপর কি বলবে না বলবে না করেও সে বলে, স্যার, এখনো তো ভ্যান এলো না।

মার্শাল একটা ফাইল নিয়ে কাজ করছে, ফাইলের উপর থেকে মুখ তুলে বলে আমিও তো তাই ভাবছি। আসার সময় অনেকক্ষণ আগেই পার হয়ে গেছে। মনে হয় এখুনি আসবে।

রবার্ট ভাবে, তার বাড়ি যেতে যখন দেরি হবে তখন বাড়িতে একটা ফোন করে দেওয়া উচিত। নইলে ওরা চিন্তা করবে, তাই সে বলে।

—স্যার, বাড়িতে একটা ফোন…।

—হ্যাঁ করবেন বই কি! এরপর কি খেয়াল হতে মার্শাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—বরং ফোন করে গাড়িটা এখানে আনিয়ে নিই।

—এক মিনিট দাঁড়ান। আমি আসছি। তারপর ফোন করবেন।

—ঠিক আছে।

মার্শাল ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। দেখতে পায়, একটু দূরে জর্জ ডিউটি করছে। ওকেই তার দরকার। তাকে ইশারা করে পাশের একটা ঘরে ডেকে নিয়ে জরুরী কথাটা বলে সে আবার চেম্বারে ফিরে আসে। এরপর সে চেয়ারে বসে ফাইলটা আবার টেনে নেয় এবং রবার্টের দিকে না তাকিয়ে বলে, আপনি ফোন করুন।

জর্জ অবাক হয়ে ভাবে, স্যার, এসব কি বলছে! আর জিজ্ঞেস করছে, সে এ কাজ করতে রাজী আছে কি না। স্যারের কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি। নইলে স্যারকে এমন বেতাল কথা বলতে সে কখনো দেখেনি, আর বদলী হয়ে এসেছে তাও দেখতে দেখতে বেশ কয়েক মাস হয়ে গেছে, কিন্তু ···। তাই জর্জ একটু ইতস্ততঃ করে বলেছে, স্যার, এ যে অন্যায়।

মার্শাল অসন্তোষ প্রকাশ করেছে, অন্যায়?

—হ্যাঁ স্যার।

—আমি তোমায় যা করতে বলছি তাই করো।

—কিন্তু কেউ যদি জানতে পারে?

—আমাদের মধ্যে কেউ না বললে জানতে পারবে না।

—কিন্তু স্যার, দেয়ালেরও তো কান আছে।

—ওসব তত্ত্ব কথা ছাড়ো। শুধু তুমি রাজী কি না আমি তাই জানতে চাই।

—মানে·········।

—ও সব মানে-ফানে ছেড়ে স্পষ্ট কথা বলো।

—স্যার······।

—আবার সেই স্যার! আমি 'হ্যাঁ' কি 'না' শুনতে চাই।

—আমার কোন ক্ষতি হবে না তো?

—আমার কথা মত কাজ না করলেই তোমার ক্ষতি হবে।

জর্জ ভয় পেয়ে গেছে, বলেছে, তাহলে স্যার, আপনার কথা মতই কাজ করছি।

—তুমি আমার উপর পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারো, মার্শাল জর্জের উপর এবার খুশী হয়েছে। জানবে, আমার দ্বারা তোমার কোন রকম ক্ষতি হবে না। যাও, কাজটা এখুনি করে ফেলো।

জর্জ আস্তে মাথা নেড়েছে, আচ্ছা স্যার।

একবার মার্শাল বারকয়েকের জন্য এদিক-ওদিকে তাকিয়ে তার কামরার দিকে ফিরে এসে রবার্টকে বলেছে। আপনি ফোন করতে পারেন।

তারপর মার্শাল চলে যেতে জর্জ ভেবেছে। স্যারের সঙ্গে এত কথা বাড়িয়ে তার কি লাভ ছিল! স্যার যা করতে বলেছে তা করে দিতে পারলেই ঝামেলায়

ঢুকে গেল। এরপর যদি কখনো সে বিপদে পড়ে তখন সে নিজেকে বাঁচবার জন্য স্যারের নাম বলতে কিছুতেই ভুলবে না। শুধু শুধু বিষ নজরে পড়ে লাভ কি! তার উপর সে কয়েক মাস হলো এখানে বদলী হয়ে এসেছে। তাকে অন্ততঃ এখানে আরো বছর আড়াই থাকতে হবে। সুতরাং প্রথমেই সামান্য ব্যাপারে ঝামেলা না বাড়ালেই ভালো।

জর্জ আরো ভেবেছে, স্যার তো তাকে মানুষ খুন করতে বলেনি। যা বলেছে তা খুবই সামান্য কাজ, না করলে এরপর পান থেকে চুন খসলেই তার ঘাড়ে এসে দোষ চাপবে।

ওদিকে রবার্ট রিসিভার তুলে নিয়ে কানে চেপে ধরতে বুঝতে পারে, ডায়াল টোন হচ্ছে না। অর্থাৎ লাইন ডেড হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বিরক্ত ভাবে রিসিভার নামিয়ে রাখে।

তা দেখে মার্শাল বলে, ফোন করলেন না?

—লাইনটা ডেড হয়ে আছে।

—এটা আজকাল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ভ্যানটাও এতক্ষণে আসছে না কেন তা কে জানে। অথচ কাউকে কিছু বলার কি জো আছে! বললেই থানা মাথায় তুলবে, ইউনিয়নকে খবর দেবে। লীডাররা এসে নানা রকম জ্ঞানের কথা বলে শাসাবে।

—হ্যাঁ তা যা বলেছেন, কথায় কথায় ইউনিয়নের ভয় দেখায়।

এরকম কিছু মামুলী কথার পর মার্শাল বলে, একটু পরে নয় আবার ট্রাই করবেন। দেখুন তখন যদি লাইন পান।

—হ্যাঁ, তাই করতে হবে।

ওদিকে সময় পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পুলিশ ভ্যানের ফিরবার নামটি পর্যন্ত নেই। ফলে রবার্ট অস্থিরভাবে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাতে থাকে এবং মনে মনে অসহায়বোধ করে।

রবার্টের মনের অবস্থা মার্শাল খানিকটা আন্দাজ করতে পারে। অথচ তার কিছুই করার নেই। শুধু একবার ওর দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সে আবার কাজের মাঝে ডুবে যায়।

অবশেষে পুলিশ ভ্যানটা এলো, এখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। আকাশে মেঘ আরো দেখা দিয়েছে। মাঝে একবার হাল্কা ধরণের বৃষ্টি হয়ে গেল। এরপর বৃষ্টি আসলেও ঝড়ো হাওয়া দিতে থাকে। অর্থাৎ বৃষ্টির স্পষ্ট ইঙ্গিত।

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে রবার্ট অ্যাটাচি হাতে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং মার্শালের দিকে তাকিয়ে বলে, স্যার, তাহলে এখন চলি, অনেক রাত হয়ে গেল এবং কাল সকালে আমি আপনার কাছে আসবো।

—কেন? মার্শাল জানতে চায়।

—আপনাকে নেমন্তন্ন করতে আসবো।

—সে হবে 'খন' কিন্তু……। মার্শাল ইতস্ততঃ করতে থাকে। তাই সে কথার মাঝে থেমে যায়।

—কিন্তু কি স্যার? রবার্টের জিজ্ঞাস্য।

—আমি বলছিলাম……।

—বলুন কি বলেছিলেন?

একটু কাছে সরে আসুন বলছি, মার্শাল একটু ঝুঁকে রবার্টের দিকে তাকিয়ে কথা বলে, এ মুহূর্তে তাকে একটু চিন্তিত দেখাতে থাকে এবং সে আস্তে কথা বলে।

—কাছে আসবো? বলে রবার্ট মার্শালের চেয়ারের একবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে না যে, ও এখন তাকে কি কথা বলতে চায়। তবে ওর মুখের ভাব দেখে তার মনে হচ্ছে, তাকে কোন কথা বলে সাবধান করে দিতে চাইছে।

রবার্ট মার্শালের দিকে ঝুঁকে পড়তে ও নিচু গলায় বলে, আপনি এত রাতে পুলিশ ভ্যানে গেলে ড্রাইভার ঠিক আপনাকে সন্দেহের চোখে দেখবে।

—সে কি স্যার? রবার্টের চোখ কপালে ওঠে গেল। ভাবে, যে রক্ষক সেই ভক্ষকের আসন এসে দখল করবে। তবে সে কাকে বিশ্বাস করবে! এ কোন জগতে সে বাস করছে! এর চেয়ে নরকে বাস করা হাজার গুণেও শ্রেয়।

—হ্যাঁ আমি ঠিকই বলছি।

—এ কথা বলার কারণ কি স্যার?

—বিকেলের দিকের অপ্রীতিকর ঘটনার কথা নিশ্চয়ই কনস্টেবল মারফত ড্রাইভারের কানে পেঁছে গেছে।

—সে তো থানার খবর একে অপরকে বলেই, রবার্ট হাল্কাভাবে কথাটা বলে। আরো যেখানে এরা একই থানায় কাজ করে। না, না, স্যার, আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। এর মধ্যে ভয়ের কোন ব্যাপার নেই।

—ভয়ের ব্যাপার আছে বলেই বলছি, মার্শাল একটু আগের মত গলা নামিয়ে কথা বলছে আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলছে। তাই আপনি অ্যাটাচি নিয়ে ভ্যানে গেলেই……।

আপনি ভাববেন না যে, এসব কথা বলে আপনাকে আমি মিথ্যে ভয় পাইয়ে দিচ্ছি।

—না, না, স্যার, তাতে আপনার লাভ কি! রবার্টকে একটু চিন্তিত দেখাতে থাকে। আপনি কথাটা বলাতে আমি অন্যভাবে ভেবে দেখছি। সত্যি ব্যাপারটা তো একবারও আমার মাথায় আসেনি। চোখে যেন সে অন্ধকার দেখতে থাকে। তাহলে স্যার, এখন উপায়?

—উপায় এখন একটাই আছে।

—কি স্যার ?

—আপনি আবার ফোন করুন।

—লাইনের যা অবস্থা তাতে………।

—তবু আবার ট্রাই করুন না! লাইন পেলে এখানে গাড়িটা আনিয়ে নিন। সঙ্গে বাড়তি লোক আসতে বলবেন। তাহলে আর ভয়ের কোন ব্যাপার থাকবে না।

—দেখি, ফোন পাই কি না।

কিন্তু টেলিফোন লাইনের সেই একই হাল। লাইন ডেড হয়ে রয়েছে। ফলে রবার্ট অসহায়ভাবে মার্শালের দিকে তাকিয়ে বলে, স্যার, লাইন এখনো ডেড হয়ে আছে ?

—আমি একটা কথা বলবো ?

—বলুন স্যার।

—আপনি বরং আজ রাতটা এখানেই থেকে যান।

—এখানে থাকবো ?

—হ্যাঁ এবং তা আপনার ভালোর জন্যই বলছি। এর মধ্যে লাইনটা ঠিক হয়ে যাবে এবং সকালের দিকে ফোন করে গাড়িটা আনিয়ে নেবেন। বলে, কোন ভয়ের ব্যাপার থাকবে না।

—কিন্তু স্যার, রবার্ট আমতা আমতা করতে থাকে।

—জানি আপনার কষ্ট হবে, কিন্তু আমি এছাড়া অন্য কোন উপায় দেখছি না। আর একজন ইন্সপেক্টর ছুটিতে না থাকলে আমিই আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম। এটা আমাদের ডিউটি। জনগণের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করা।

রবার্ট মাথা নাড়ে এবং মনে মনে মার্শালের ব্যবহারের জন্য ওকে অভিনন্দন জানায় এবং বলে, আপনি যে বলেছেন এই যথেষ্ট।

—তাহলে কি করবেন ?

—থাকতে ঠিক মন চাইছে না, আপনার কথা ফেলতেও ভরসা পাচ্ছি না। তার উপর দিনকালের অবস্থা তো ভালো নয়।

—সেজন্যই আপনাকে আমি ও কথা বললাম।

—তা আমি বুঝতে পেরেছি, থেকেই যাই, কি বলুন ?

—আমি তো সে কথাই আপনাকে বলছি।

—ঠিক আছে, আপনারকথা মতই কাজ করছি। তবে এখানে থাকলে বাড়িতে সাংঘাতিক চিন্তা করবে। এখুনি থানা-পুলিশ হাসপাতাল করছে কি না তা কে জানে! করাই স্বাভাবিক, কারণ আমার তো এত দেরী করার কথা ছিল না।

—সে তো ঠিকই। তবে এ থানায় ফোন করলে তো কোন কথাই নেই। আপনার খবর পেয়ে যেত, আর আমরাও যে ফোন করে খবর পাঠাবো তারও কোন উপায় নেই।

– হ্যাঁ সে তো ঠিকই, তবে ওরা এখানে ফোন করবে না। এটা তো স্থানীয় থানা নয়।

—তা অবশ্য আপনি বলতে পারেন। কথার মাঝে মার্শাল ফাইলে খস খস করে কি যেন লিখে যাচ্ছে।

—আমি কি এ চেয়ারটাতেই বসে থাকবো।

—না, না, তা করতে যাবেন কেন! মার্শাল ফাইলের উপর থেকে চোখ তুলে রবার্টের দিকে তাকায়।

—তাহলে? রবার্ট ঈষৎ বিব্রত।

—আমার পাশের ঘরটাই ফাঁকা পড়ে আছে। ওখানে একটা খাটিয়াও রয়েছে। স্টোর-কাম-রেস্ট রুম হিসেবে এটা ব্যবহার হয়। একটু থেমে মার্শাল আবার বলে। আজকের রাতটা ওখানে কষ্ট করে কাটিয়ে দিন। আর একটু পরে আমি আপনার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করছি।

—কিছু খাবার মত আর মনের অবস্থা নেই। শুধু এক গ্লাস জল খেয়েই শুয়ে পড়বো। সারাদিন শরীরের উপর দিয়ে অনেক ধকল বয়ে গেছে। এ বয়সে এসব আর সহ্য হয় না।

রবার্ট একটু দম নিয়ে আবার বলে, সত্যি, আজ যে আপনি আমায় কত ভাবে সাহায্য করলেন. সে এক আমি জানি, আর জানে আমার ভগবান। আপনার এই মহানুভবতার কথা আমি জীবন থাকতে ভুলতে পারবো না।

মার্শালের মুখে বিনয়ের হাসি ফুটে ওঠে। পুলিশ বিভাগে রয়েছি। তার উপর বাড়ি বহু দূরে। তাই রাতদিন একরকম আমি থানাতেই পড়ে থাকি। কত কেস দেখি, অবাক হই। তার মাঝে যতটা সম্ভব মানুষকে সাহায্য করতে চেষ্টা করি।

—সে আপনার ব্যবহার দেখেই আমি বুঝতে পারছি।

তারপর মার্শাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, চলুন আপনাকে ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আসি।

—হ্যাঁ চলুন। বড্ড টায়ার্ড লাগছে। একটু হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করতে পারলে ভালো হবে। শরীর আর বইছে না। সেই কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।

এরপর মার্শালকে অনুসরণ করে রবার্ট পাশের ঘরে প্রবেশ করে। ঘরটা আকারে মন্দ নয়। ঘরে একটা কাঠের আলমারি রয়েছে। তাতে কিছু মাল পত্তর আছে। দক্ষিণ দিকের জানালা ঘেঁষে দড়ির খাটটা পাতা রয়েছে,

আর ঘরের একদিকে দরজায় খিল দেওয়া আছে।

মার্শাল বললো, ঠিক আছে, আপনি তাহলে শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার জন্য জল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—হুঃ। সারাদিন আমি নানাভাবে আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম।

—আরে না, না, এতে বিরক্তির কি আছে! আপনাকে যেটুকু সাহায্য করতে পারলাম, তা আমার ডিউটির মধ্যেই রয়েছে। বলে মার্শাল কাজের তাড়ায় তার চেম্বারের দিকে পা বাড়ায়।

মার্শালের চেম্বারে যাওয়া হলো না! সে বাধা পায়।

—স্যার, রবার্ট ডাকে।

—রবার্টের ডাকে মার্শাল পিছন ফিরে তাকায়, আমায় কিছু বলবেন?

—হ্যাঁ স্যার, একটু অনুরোধ করতাম।

—অনুরোধ? মার্শাল মুখ কুঁচকে বলে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

—বলুন কি বলবেন?

—অ্যাটাচিটা আপনার কাছে রেখে দিন। রাতে কাছে রাখতে ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। কখন ঘুমিয়ে পড়বো তা তো বলা যায় না। তার উপর সারাদিন শরীরের উপর দিয়ে অনেক ধকল বয়ে গেছে।

—আপনি তো থানাতেই রয়েছেন। ভয় কি?

—তবু স্যার, আপনার কাছে রাখুন। আপনার কাছে থাকলে একবারে সেফ। ঘুমোলেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারবো।

—রাখতে পারি, তবে আবার মানি রিসিটের ব্যাপারে যেতে হবে।

—আবার মানি রিসিট কেন?

—এটা যে নিয়ম।

—আপনার কাছ থেকে মানি রিসিট নেওয়া মানে আপনাকে অবিশ্বাস করা। আসলে রবার্টের এখন এসব একবারে ভালো লাগছে না। শুতে পারলে সে এখন বাঁচে।

—এটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। এটা নিয়ম।

—কিন্তু নিয়মেরও তো ব্যতিক্রম আছে। ঠিক আছে, দিতে যখন চাইছেন তখন দিন। রবার্ট একটা কথা ভেবেই এটা বলে। সে টাল খাওয়া পোড় খাওয়া মানুষ। তার উপর ব্যবসায়ী। প্রমাণ রেখে কাজ করা দরকার। পরে তো অবিশ্বাসও করতে পারে। তার উপর বলতে গেলে অপর পক্ষ একবারে অচেনা মানুষ। কার মনে কি আছে তা তো আগে ভাগে বলা যায় না।

—দাঁড়ান, আমি আসছি, মার্শাল অ্যাটাচিটা নিয়ে যেতে যেতে বলে। আমি মানি রিসিটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এরপর মার্শাল চেম্বারে ফিরে এসে বেল বাজায়। এর মধ্যে তার অ্যাটাচি'র টাকা গোনা হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে জর্জ হাজির হয়। স্যার আমায় কিছু বলবেন ?

—হ্যাঁ। পাশের ঘরের ভদ্রলোককে এই মানি রিসিটটা দিয়ে এসো।

জর্জ সায় জানিয়ে মানি রিসিটটা নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে রবার্টকে দিয়ে আসে। তাতে রবার্ট ওকে ধন্যবাদ জানায়।

জর্জ চলে যেতে রবার্ট মানি রিসিটে চোখ বুলিয়ে দেখে টাকার অঙ্কটা ঠিক লেখা আছে। এরপর ওটা পকেটে রেখে খাটিয়ার উপর দেহের ভার ছেড়ে দেয়। আঃ।

রবার্টকে আবার বিছানা ছেড়ে উঠতে হলো। লাইটটা বড় চোখে লাগছে। লাইটটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ে, কিন্তু ঘুম তার ত্রিসীমানায়ও আসছে না। বারবার তার বাড়ির কথা মনে পড়ছে। ওদের অসহায় মুখগুলো তাকে বড় পীড়ন করতে থাকে। আর ওদের চিন্তা হবে বই কি! এ রকম কখনো সে তো না জানিয়ে কোথায় এর আগে কোনদিন থাকেনি।

রবার্টের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। খাটিয়ায় শুয়ে সে যেন ছটফট করতে থাকে। 'ঘুম' নামক শব্দটা তার অভিধান থেকে যেন বিদায় নিয়েছে কিন্তু এক সময় সে ভীষণভাবে ক্লান্তবোধ করতে থাকে। তারপর কখন যে তার দু'চোখে ঘুম নেমে এসেছে তা সে নিজেই জানে না।

রাত এখন ক'টা হবে তা কে জানে। হঠাৎ একটা চাপা ফিস ফিসানির শব্দে রবার্টের ঘুম ভেঙে যায়। বরাবরই তার ঘুম একটু পাতলা ধরনের আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আরো পাতলা হয়েছে।

প্রথমটা রবার্ট ততটা গুরুত্ব দেয় না। আবার দু'চোখের পাতা এক করতে চেষ্টা করে, কিন্তু একবার ঘুম ভাঙলে সহজে সে ঘুম আর আসতে চায় না। আর বুড়ো বয়সেতে তো নয়ই।

কয়েকটা মশা ভ্যান ভ্যান করে উড়ছে। রবার্টকে এর আগে বেশ কয়েকবার হুল ফুটিয়েছে। ঘরে আলো না থাকায় মশাগুলোকে সে দেখতে পাচ্ছে না। তবু কয়েকবার হাত চালালো। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। একটা মশাও মরেনি।

রবার্ট ফের ঘুমোতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঘুম আর আসে না। যত রাজ্যের চিন্তা তার মাথায় কিলবিল করতে থাকে।

হঠাৎ রবার্ট চোখ খুলে ঘরের চারদিকে তাকাতে থাকে। ঘুরে দেখে ঘর একেবারে ফাঁকা। কথা বাইরে থেকে আসছে, আর রাত বাড়ার ফলে চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ। ফলে চাপা কথাও তার শুনতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আর পাশের ঘর থেকে বলছে বলে সেই কথাগুলো স্পষ্টভাবে তার কাছে ধরা দিচ্ছে।

রবার্ট মার্শালের গলা শুনতে পায়। পর মুহূর্তে সে ভাবে মার্শাল হয়তো তার সহকারীদের নিজের নিরাপত্তার কথা বলছে। সত্যি, ওর মত মানুষ হয় না।

কিন্তু রবার্টের একটা কথা কাঁটার মত তার বুকের মাঝে খঁচ খঁচ করতে থাকে। ওরা চাপা স্বরে কথা বলছে কেন? এর মধ্যে কি কোন কুমতলব থাকতে পারে? না, না, এসব কথা ভাবাও পাপ। এর চেয়ে অন্যায় আর কি হতে পারে! বিশেষ করে মার্শালের ব্যাপারে। ও তাকে কতভাবে সাহায্য করে চলেছে। তবু কান খাড়া করে সে ওদের কথাবার্তা শুনতে থাকে।

মার্শালের গলা, জর্জ বেকার, মাইকেল এবং হেনরী সবাই আমার কথা বেশ মন দিনে শোন।

মাইকেল এবং হেনরী মার্শালের যেন ডান আর বাঁ হাত। মাইকেল অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলে, বলুন স্যার, আমরা সব শুনছি। আমাদের কি করতে হবে তাই জানান।

মার্শাল বলে, তার আগে তোমাদের সকলকে একটা কথা বলতে চাই।

—বলুন স্যার, হেনরী সায় জানায়।

—তোমাদের প্রত্যেককে আমি বিশ্বাস করতে পারি?

মাইকেল জিভে কামড় দিয়ে বলে। স্যার, এ কি বলছেন!

হেনরী বলে, স্যার, বিপদে-আপদে আমরা কত রকমের সাহায্য আপনার কাছ থেকে পাচ্ছি। বলতে গেলে আপনিই আমাদের মা-বাপ।

জর্জ ও বেকার একটু মিনমিনে স্বভাবের লোক। তা মার্শাল বেশ ভালো করেই জানে। তাই সে আগে ওদের দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিতে চায়। আবার কথাটা ওদের না বললেও নয়। ঠিক টের পেয়ে যাবে। সেজন্যই ওদের বলা এবং আগে-ভাগে বলে ওদের রাজী করিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

তাই মার্শাল জর্জের দিকে তাকিয়ে বলে, কি ব্যাপার জর্জ, তুমি যে কোন কথা বলছো না?

—আমি আর কি বলবো স্যার! জর্জ হাত কচলে কথাটা বলেই ভাবে। একটু আগে স্যারের নির্দেশে সে থানার টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়েছে! আবার স্যার তাকে কোন বিপদে জড়াতে চায় কিনা তা কে জানে। আর স্যারের কথার ধরনও ঠিক সুবিধের বলে তার মনে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই কোন কুমতলব আছে। নইলে এত ঘটা করেই বা তাদের মত নিতে চাইছে কেন! তবু সে মিনমিনে গলায় বলে, স্যার, আপনার হুকুম তো তামিল করতে হবেই।

—বেশ ভালো কথা, মার্শাল খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো।

তারপর মার্শাল জর্জের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বেকারের দিকে তাকায়,

তোমার মতটা জানতে পারলে হতো।

— আপনার কথার অবাধ্য হবো কেন স্যার, বেকার যেন শিকারের সন্ধান পায়। তবে কি ধরণের শিকার করতে হবে তা সে এখনো বুঝে উঠতে পারেনি। তাই ওর খানিকটা অস্বস্তি। তবে তার ধৈর্য ধরতে হবে। তাহলেই সব সে জানতে পারবে। তখন আর তার কাছে কিছুই অজানা থাকবে না।

—তাহলে এবার কথাটা সকলকে বলতে পারি? মার্শালের দৃষ্টি এখন হেনরীর দিকে। কি হেনরী?

—হ্যাঁ স্যার, হেনরী সায় জানায়।

—কথাটা কিন্তু খুবই গোপনীয়।

—গোপনীয়। নিজের অজান্তেই কথাটা যেন এক রকম মুখ ফসকে বেকারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

মার্শাল দাঁতে দাঁত চেপে বলে, হ্যাঁ।

—পুলিশ লাইনের সব কথাই তো গোপনীয়, মাইকেল স্যারের কথার সমর্থন জানিয়ে বলে। আর এখানকার কোন কথাই পাঁচ কান করতে নেই।

—সে কথা ওদের একটু ভালো করে বুঝিয়ে দাও তো দেখি! বলে মার্শাল তাচ্ছিল্যভরে জর্জ এবং বেকারের দিকে তাকায়।

—স্যার, কথাটা কি বলুন, হেনরী জানতে চায়।

এ কথার জবাব না দিয়ে মার্শাল অন্য কথা বলে। সে বলে, এ কাজটা করতে পারলে তোমরা বেশ কিছু টাকা পাবে।

— আমরা কাজটা করতে পারলে প্রত্যেকে টাকা পাবো? হেনরীর জীবে যেন জল এসে যায়।

—হ্যাঁ তা পাবে, মার্শাল মিটি মিটি করে হেসে মাথা নাড়ে।

— স্যার, আপনার কথা আমরা টাকা ছাড়াই করতে রাজী আছি। ধূর্ত মাইকেল জানায়। শুধু স্যার, হুকুম করুন। দেখবেন কাজটা হয়ে গেছে।

—তা আমি জানি মাইকেল, মার্শাল মাইকেলের কথায় খুশী হয়। এরপর সে টাকার কথায় আসে। জানে এটাই হলো সিলভার টনিক। এ দিয়ে গোপনে তার কাজটা সারতে হবে। এই যে জর্জ ও বেকার কিন্তু কিন্তু করছে তখন টাকার কথা শুনে ওরা প্রথমটা রাজী না হলেও পরে নিজে রাজী হয়ে ঘাড় কাত করবে। বলতেই বলে টাকা। এদিয়ে কোন কাজটা না হয়। এ যেন যাদুর মারাকাঠি।

এরপর মার্শাল সবার দিকে তাকিয়ে বলে, এ কাজের জন্য তোমরা প্রত্যেকে তিন হাজার নয়, পাঁচ হাজারও নয়, একবারে দশ হাজার করে টাকা পাবে।

—দশ হাজার টাকা? হেনরীর চোখ প্রায় ঠিকরে যেন বেরিয়ে আসতে

চাইছে, সেই সঙ্গে তার দারুণ আনন্দ হচ্ছে।

—হ্যাঁ, তাই পাবে।

টাকার কথা শুনে মাইকেল বলে, এবার বলুন স্যার, আমাদের কি কাজ করতে হবে ?

—তাহলে কথাটা বলেই ফেলি।

—হ্যাঁ স্যার।

—কিন্তু খুব সাবধানে কাজটা সারতে হবে।

—তাই হবে স্যার, মাইকেল আশ্বাস দেয়। স্যার, এমনভাবে আমরা কাজটা করবো যে কাক পক্ষীতেও টের পাবে না।

—ভেরি গুড!

—এখন শুধু স্যার, আপনি আমাদের হুকুম করুন, আর আমরা প্রত্যেকে দশ হাজার করে টাকা পাবো। তাই কাজটা আমাদের নিজেদের গরজেই ভালো-ভাবে করতে হবে।

— আমি সেটাই তোমাদের বলতে চাইছি, মার্শাল এতক্ষণ নিচু গলায় কথা বলছিল। এবার আরো চাপা গলায় বলে। যা বলছি এখন খুব মন দিয়ে শোন।

সবাই মার্শালের দিকে একটু ঝুঁকে তাকায়। তাদের চোখের পলক যেন পড়ছে না। ওদের সবার মধ্যে একটা উত্তেজিত ভাব।

আর একদিকে বরার্টের চোখের ঘুমও উধাউ। গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনে সে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দরজার গায়ে কান দিয়ে ওদের কথা শুনবার চেষ্টা করছে, যে দিক দিয়ে ওদের কথা ভেসে আসছে। তার ব্যাপারটা ঠিক সুবিধের বলে আদৌ মনে হচ্ছে না।

মার্শাল এবার বলে, শোন, আমার পাশের ঘরে একটা লোক আছে। তাকে চিরদিনের জন্য এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

বড় অঙ্কের টাকার কথা শুনে রবার্টের মনে সন্দেহ হয়েছিল। এবার তাকে খুন করার কথা স্পষ্ট শুনলো, আর এখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে। কেন তাকে ফোন করতে বারণ করেছিল এবং ফিরে এসেই বললো যে এখন ফোন করতে পারেন। অর্থাৎ তার আগে সে লাইন কাটিয়ে দিয়ে এসেছে এবং তার মনে পাপ ছিল বলে তাকে ভ্যানে যেতেও বারণ করেছে এবং গুণ্ডাগুলোকে পর্যন্ত শাসিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। লোকটা তাহলে মুখোসের আড়ালে একটা পাকা শয়তান। অথচ কত মিষ্টি করে তার সঙ্গে কথা বলছিল, কিন্তু এর হাত থেকে তার এখন মুক্তির উপায় ? যেন সাক্ষাৎ যম এসে দাঁড়িয়েছে, আর টাকার কথা যখন বলেছে তখন ওরা নিজের গরজেই এ কাজ করবে তাতে কোন শনি মঙ্গলবার নেই। টাকায় দুনিয়া বশ আর ওরা তো সেই তুলনায় সামান্য কর্মচারী।

দশ হাজার টাকা ওদের কাছে অনেক কিছু এবং মার্শাল এ থানার এখন ভারপ্রাপ্ত অফিসার। তাকে ওরা খুশী করতে চাইবে এবং তার চেয়েও বড় কথা হলো, এ কাজটা করতে পারলে ওরা প্রত্যেকে দশ হাজার টাকা পাবে। এখন এটাই ওদের কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—বরার্ট অবাক হয়ে একটা কথা কিছুতেই ভাবছে না, যদিও এখন এ সব কথা ভাবার মত তার মনের অবস্থা নেই। তবু সে কথাটা না ভেবে কিছুতেই পারছে না। ওরা দলে চার জন। ওরা এখন পর্যন্ত কেউ জানতে চাইলো যে, লোকটাকে মারবো কেন? লোকটা কি অপরাধ করেছে? তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস পরে হয়তো জিজ্ঞেস করবে। বিবেক বলেও তো কিছু আছে। তবে এ দুনিয়া টাকার বশ। বিবেকের কোন নাম নেই। শুধু একটা গাল ভরা কথা। ব্যাস, আর কিছু নয়।

রবার্ট মশার জ্বালায় অস্থির হয়ে একটু আগে হাত-পা ছুঁড়ছিল। এখন তার এ কথা শোনার পর হাত-পা ছোঁড়া একবারে বন্ধ হয়ে গেছে। উল্টে এখন সে গলগল করে ঘামছে। আসলে একটা মৃত্যুভয় তাকে পেয়ে বসেছে।

এবার রবার্ট হেনরীর কথা শুনতে পায়। ও বলছে, স্যার, লোকটা কি আপনার শত্রু?

—হ্যাঁ, মার্শাল দৃঢ়ভাবে জবাব দেয়। আর এর জন্য তোমরা প্রত্যেকে দশ হাজার করে টাকা পাবে এবং আমার কথা সবাই তোমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারছো। আমি তোমাদের ঠকাবো না।

হেনরী হেসে জিবে কামড় দেয়, না, না, স্যার, আপনি আমাদের ঠকাবেন কেন!

মার্শাল এবার সবার দিকে তাকিয়ে বলে, তাহলে ঐ কথা রইলো?

কিন্তু স্যার, জর্জ কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না। ইতস্ততঃ করতে থাকে।

মার্শাল চাপা গলায় গর্জে ওঠে, বলো! কি বলবে?

জর্জকে কিন্তু কিন্তু করতে দেখে বেকার জোর পেয়ে যায়। সে জর্জের হয়ে জবাব দেয়, সামান্য দশ হাজার টাকার জন্য একটা নিরপরাধ লোককে আমাদের খুন করতে বলছেন?

মার্শাল তির্যক দৃষ্টিতে বেকারের দিকে তাকায়। তার চোখ দুটো যেন এখন জ্বলতে থাকে। সে রাগে যেন হিস হিস করতে থাকে। সে বলে, অর্থাৎ চাপ দিয়ে বেশী টাকা আদায় করতে চাইছো?

—না স্যার, বেকার মাথা নাড়ে। টাকার অংক বাড়াবার কথা একবারও বলছি না। শুধু আমার আপত্তি একটা ব্যাপারে।

—আপত্তি? মার্শাল চেপে কথা বলতে গিয়েও পারে না। তবু পরিস্থিতির

কথা মনে করে সে নিজেকে সংযত করতে চাইছে।

—হ্যাঁ, বেকার মাথা দোলায়।

—তা আপত্তিটা কিসের ব্যাপারে ?

—খুন করার ব্যাপারে।

বেকার প্রতিবাদ জানাতে জর্জ জোর পেয়ে যায়। সেও ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে, স্যার, আমারও এ কাজে সায় নেই।

এবার বেকার বলে, স্যার, আমায় দয়া করে এ কাজে জড়াবেন না। সে কাতরভাবে মিনতি জানায়।

মার্শাল এবার আর নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে পারে না। চাপা ক্রোধে ফেটে পড়ে, আমার সঙ্গে বেইমানি করতে চাইছো!

— বেইমানি ?

—হ্যাঁ।

—আমি আপনার সঙ্গে ?

—হুঁ।

—না, না, স্যার। এ কথা অন্ততঃ আমায় বলবেন না। অফিসের কাজের ব্যাপারে আপনি আমায় যখন যেটা করতে বলছেন, আমি কখনো তা 'না' করিনি। বিনা বাক্য ব্যয়ে আমি সে কাজ করেছি।

—তা যখন করেছো তখন তাহলে এ কথা বলছো কেন।

—এটা আমার নীতি বিরুদ্ধ কাজ।

—নীতি বিরুদ্ধ তোমার ?

—হ্যাঁ স্যার।

—তাহলে এখন তো আমায় একটা কথা বলতেই হচ্ছে। ভেবেছিলাম বলবো না। তুমিই আমায় বলতে বাধ্য করাচ্ছো। তোমার নীতি বলে কিছু আছে নাকি ?

—কেন থাকবে না স্যার।

— থাকলে তুমি কখনো ঐ কাজ করতে পারতে ?

— কোন কাজ স্যার ?

—সব জেনেও না জানার ভান করছো!

—সব আমি কি জানি ?

—ন্যাকা যখন সাজছো তখন আমাকেই বলতে হবে। মার্শাল তার কথার মধ্যে দিয়ে বেকারকে হুল ফোটাতে চায়।

একটু থেমে মার্শাল আবার বলে, গত মাসেও তোমায় আমি উইদআউট লিভে পাঁচদিন ছুটি দিয়েছি। আমি রিস্কে সে কাজ করেছি। জানতে পারলে আমার চাকরি যাবে। আগে তো চার্জ সীট দেবে। সব চেয়ে বড় কথা

হলো, মান ইজ্জতের প্রশ্ন। এর মাঝে এক মাসও হয়নি, আর এর মধ্যেই তুমি আমার সঙ্গে বেইমানি করছো!

—স্যার, বেইমানি আমি করছি না।

—তবে এর চেয়ে শত্রুতা আর কাকে বলে!

তার জবাবে বেকার কি যেন বলতে যাচ্ছিল। সে বাধা পায়। ফলে তার বলা হয় না।

জর্জ বলে, স্যার, ব্যাপারটা যদি জানাজানি হয়ে যায়?

মার্শাল ভাবে, রাগারাগি করলে কাজটা হবে না। অত্যন্ত চালাক সে। তাই সে নিজেকে সংযত করে এবং কিছুটা শান্তভাবে বলে, কেউ কোন কিছু জানতে পারবে না। সে দায়িত্ব আমার। শুধু আমি যা বলছি সেই মত কাজ করে যাও। এ কথা বলে সে ওদের আশ্বস্ত করতে চায়।

ওরা নিমরাজী হয়ে স্যারের কথায় সায় জানায়।

ওদিকে হেনরী ভাবতে থাকে, দশ হাজার টাকা পেলে সে কি করবে। ভাবে প্রথমে সে দেশে যাবে। গিয়ে ওখানে কি করবে মনে মনে তার একটা পরিকল্পনা করতে থাকে। টাকার একটা আলাদা মাদকতা আছে, যা মানুষকে বিভোর করে রাখে। যেখানে দশ হাত মাটি খুঁড়লে একটা পয়সা পাওয়া যায় না, সেখানে যদি এক রকম বিনা পরিশ্রমে দশ হাজার টাকা এসে যায়, তাহলে মন্দ কি! কপালে থাকলে এসে যায় বই কি!

আর একদিকে মাইকেল ভেবে চলে, এবার জুলি তার না হয়ে কিছুতেই যায় না। জুলিকে তার চাইই চাই। ও ছাড়া তার কিছুতেই চলবে না। চাঁদীর জুতো মারতে পারলে ও ঠিক সুড়সুড় করে তার কোয়ার্টারে এসে ঢুকবে। তখন আর সে কোন রকম আপত্তি তুলবে না। ফলে এখন সে ওকে একান্ত করে কাছে পাবার নেশায় বিভোর হয়ে রইলো। এবং হেনরীর মত সেও ভাবে, স্বয়ং স্যার যখন এ হত্যাকাণ্ডের পিছনে রয়েছে তখন তার আর কোন চিন্তা নেই।

জর্জ এবং বেকার ভাবে, এরপর কথা না বাড়ানোই ভালো। তারা না করলেও ওরা হাসতে হাসতে এ কাজ করে দেবে। সাক্ষাৎ যেন যম এক একটা। ওরা পারে না এমন কোন কাজ নেই। নইলে চোর, গুণ্ডা, পকেটমার গুলোকে ওরা এমন ভাবে পেটায় কি করে। শরীরে ওদের দয়া মায়া বলে কিছু নেই, আর এখন আপত্তি করা মানে যতদিন এখানে কাজ করবে ততদিনই সাহেবের বিষ নজর ওদের উপর থাকবে। পান থেকে চুল খসলেই হয়তো 'শো কজের' নোটিস হাতে ধরিয়ে দেবে। জলে বাস করে কি আর কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করলে চলে! তাছাড়া, তাদের না আছে জনবল, না আছে অর্থবল। সুতরাং নিজেদের পায়ে যেচে কুড়োলের কোপ বসিয়ে লাভ কি। যবনের হাতে যখন পড়েছে

তখন খানা খেতেই হবে। এ থেকে কোন মতেই তাদের রেহাই নেই।

তবু যেন বেকার ব্যাপারটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তার সংসারে অভাব অনটন আছে ঠিকই, কিন্তু দরিদ্রের সংসারে ঐ দশ হাজার টাকার কোন দাম নেই। সাময়িকভাবে হয়তো কিছুটা দুঃখ দারিদ্র ঘুচবে, কিন্তু তারপর? তখন শুধু নিজের বিবেক যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। এছাড়া তখন অন্য কোন উপায় থাকবে না। আর পাপ কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। একদিন না একদিন তাদের এই পাপের কাহিনী ঠিক বেরিয়ে পড়বে। তখন লোকে তাকে ছিঃ ছিঃ করবে। সংসারের লোকেরা পর্যন্ত তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। ছেলে-মেয়েদের দিকে পর্যন্ত তাকাতে পারবে না। তারা বাবাকে ঘৃণা করবে। সুতরাং বেঁচে থেকে প্রতি মুহূর্তে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এ সব কথা ভেবে তার বুকের মধ্যে যেন হাত পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

বেকারের চিন্তায় ছেদ পড়ে।

হেনরী বলে, স্যার, আমাদের কি ভাবে কাজটা করতে হবে।

মার্শাল এ কথা আগেই ভেবে রেখেছিল। তাই সে বলে, শোন, আরো ঘণ্টা খানেক পরে ঐ লোকটাকে খতম করে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে যে বড় গাছটা আছে তার তলায়ই কবর দেব, আর ওখান থেকে লাশ সরাবার কোন দরকার নেই এবং জানবে, তোমরা ঠিক থাকলে কেউ ব্যাপারটা টের পাবে না। আর ব্যাপারটা বেরিয়ে পড়লে তার কি পরিণতি হবে তা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো। তা বলার দরকার নেই। আরো যখন সবাই পুলিশে কাজ করো।

কথাটা বলেই মার্শাল ভাবে, এ টাকাটা তার চাই। এ টাকাটা পেলে সে অ্যালবার্টকে মোটা টাকা দিতে পারবে। ও টাকা না পেলে কোন কাজ করতে চায় না। এটা পেলে তার বদলী সারেতে অনিবার্য। একবার ওখানে যেতে পারলে টাকার খনিতে গিয়ে বসবে। রোজ দু'হাত ভরে টাকা লুটতে পারবে। আর এখানে টাকার আমদানি প্রায় নেই বললেই চলে। সুতরাং এ অবস্থায় বাঁচা যায় না। বাঁচলে সিংহের মত বাঁচা দরকার। নইলে কুকুর-বেড়ালের মত বেঁচে লাভ কি। আর হাতে তেমন টাকা না থাকায় গার্ল ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে তেমন করে স্ফূর্তি পর্যন্ত করতে পারে না। ওদের কথা নয় সে ছেড়েই দিল। মদ খাবার টাকা পর্যন্ত প্রায় সময়ই থাকে না। তার উপর সে ডিভোর্সের দিকে ঝুঁকছে। এখন লিজকে তার চাই। ও তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ও তার আশা আনন্দের উৎস। ওকে একান্ত আপন করে নিজের কাছে পেতে হলে মোটা টাকা চাই, সেই সঙ্গে একটা ভালো অ্যাপার্টমেণ্টে উঠতে হবে। এ সব নোংরা পুলিশী কোয়ার্টারে থাকা চলবে না। সুতরাং চাই তার টাকা। টাকা ছাড়া কিছুই হবে না, আর কপাল মন্দ হলে ধরা পড়বে। নো রিস্ক নো

গেল। হয়তো ভালোভাবে বাঁচ, নইলে একবারে মরে যাওয়া ভালো।

মাইকেল এক গাল হেসে বলে, স্যার, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। যেমন বলেছেন ঠিক তেমনই ভাবেই কাজটা হয়ে যাবে।

মার্শালের আনন্দ যেন উপছে পড়ছে। লিজার যৌবনবতী মুখটা বার বার তার মুখের সামনে ভেসে উঠে, ও কাজে তাকে দারুণ ভাবে প্রেরণা যোগাতে থাকে। ফলে সে আনন্দে দিশেহারা।

মার্শাল এবার হেসে হেনরীর দিকে তাকায়, হেনরী ?

—স্যার, আমারও ঐ একই কথা।

মার্শাল ওদের পিঠ চাপড়ে বলে, ঠিক আছে।

এরপর আর ওদের কথা শোনা যায় না। রবার্ট ভয়ে যেন ঘেমে নেয়ে অস্থির, এখন তার কি করা উচিত তা সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। এ মুহূর্তে তার সমস্ত চিন্তাধারা জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আসলে মৃত্যুভয় তার সমস্ত চিন্তা ভাবনা ওলট-পালট করে দিচ্ছে।

রবার্ট খাটিয়ার উপর এসে বসে। ঘুম তার মাথায় উঠেছে। না, না, তাকে এখান থেকে যে করে হোক পালাতেই হবে। নইলে ওদের হাত থেকে তার কিছুতেই রেহাই নেই। নিশ্চিত মৃত্যুর স্বাদ সে যেন একটু একটু করে অনুভব করতে থাকে।

কিন্তু পালিয়ে যাবে বললেই তো আর পালিয়ে যাওয়া যায় না। রবার্ট ভাবে। সে পালাবে কি করে ? ওদের নজর বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়া প্রায় অসাধ্য, তবু তাকে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে হবে, যাতে সে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারে, নইলে এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিজেকে ঠেলে দেবার কোন মানে হয় না।

রবার্ট ভাবে, সে মারা গেলে কোন ক্ষতি নেই। তার যা বিষয় সম্পত্তি আছে তাতে ওদের কোন রকম চলে যাবে, কিন্তু সে মারা গেলে সুশানের বিয়েটা পিছিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে আরো নানা রকম সমস্যা দেখা দেবে, বিশেষ করে তার ব্যবসার। এতে ছেলে মেয়েদের কোন আগ্রহ নেই।

রবার্ট খাটিয়া ছেড়ে উঠে ঘরের মাঝে এসে দাঁড়ায়, যাতে কোন রকম শব্দ না হয়। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ যেন সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে। হঠাৎ কি ভেবে লাইটের সুইজের দিকে হাত বাড়াতে হাতটা সে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নেয় এবং সে নিজেকে দোষারোপ করতে থাকে। লাইট জ্বালানো মানে ওরা জেনে যাবে যে, ও জেগে আছে। ওদের কথা সে হয়তো শুনে থাকবে। যাও বা নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারবে, আর ওটা করলে তাও পারবে না।

এরপর রবার্ট খিল দেওয়া দরজার সামান্য ফুট দিয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করে। বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু জমাট বাঁধা অন্ধকারের

কুয়াশা যেন চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

তারপর রবার্ট বাইরের দিক দিয়ে যতটা সম্ভব চোখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায়। সেখানে সে আলোর একটা রেখা দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে ওখান থেকে সরে আসে।

রবার্ট লক্ষ্য করে, এদিকটা যেমন গাঢ় অন্ধকার, তেমন কোন সাড়া শব্দ ভেসে আসছে না, তার মতে এদিকটাই নিরাপদ বলে মনে হলো এবং পালাতে হলে তাকে ও পথটাই বেছে নিতে হবে।

তার পর মুহূর্তে রবার্ট ভাবে, সত্যিই কি ওটা নিরাপদ পথ? ওর আশে পাশে কেউ দাঁড়িয়ে নেই? নিশ্চয়ই আছে। ওরা এত বোকার মত কাজ করবে তাই বা কি করে ভাবা যায়! তবু তাকে ঝুঁকি নিতে হলো ঐ পথই ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু তার আগে তাকে তো দরজাটা খুলে বেরুতে হবে।

এরপর সাত পাঁচ ভেবে রবার্ট অতি সাবধানে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে কান পাতে, না, কোন রকম শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে না। ভাবে, এবার দরজাটা খোলা দরকার, যাতে কোন রকম শব্দ না হয়, আর শব্দ হওয়া মানে ওদের হাতে ধরা পড়ে যাওয়া। তাহলেই ওরা তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কবর দেবে। হাতের শিকার কেউ কি সহজে ছেড়ে দিতে চায়? চায় না।

তারপর রবার্ট শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে খুব আস্তে আস্তে দরজাটা খুলতে পারলো এবং সামান্যতম শব্দ না হওয়ায় সে অবাক হলো। সেই সঙ্গে তার জন্য সে মনে মনে করুণাময় ঈশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ জানালো। গুরুদেবের কথাও সে ভুললো না। ভাবে, এ অসাধ্য কাজ সে করলো কি করে! এ ওদেরই আশীর্বাদ।

এবার সাংঘাতিক ভয়ের সঙ্গে দরজাটা সামান্য ফাঁক করে রবার্ট বাইরের দিকে তাকায়। এ দরজাটা সব সময় বন্ধ থাকে। এদিক দিয়ে কোন যাতায়াতের পথ নেই। এদিকটা কেউ ব্যবহার করে না। ফলে সে এখানে কাউকে দেখতে পেল না। এসে সে দারুণ নিশ্চিন্ত বোধ করলো।

এদিকটা অন্ধকারের মাঝে ছেয়ে রয়েছে। জোনাকি উড়ছে। বাতাসে গাছের পাতার একটানা শব্দ হয়ে চলেছে, যেন ওরা ভূত-প্রেতের সাক্ষী হয়ে অপরের সঙ্গে একান্ত গোপনে ফিস ফিস করে কথা বলে চলেছে এবং ওদের কথা বলতে যেন আরো সুবিধে হয়েছে এদিকটা গাছপালা এবং আগাছায় ভর্তি থাকায়।

রবার্ট ভাবে, সে এখান দিয়ে বেরুবে কি করে? সে মনের দিক দিয়ে এক পা এগোয় তো দশ পা পিছোয়। আসলে সে এখন অসম্ভব রকম ভীতু হয়ে পড়েছে। শেষে সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কিছুটা মরিয়া হয়ে বেড়ালের নিঃশব্দতা অবলম্বন করে সে পা টিপে টিপে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

পাঁচিলটা বেজায় উঁচু এবং প্লেন। এতটা ওঠা রবার্টের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। উঠতে গেলে ঠিক পা পিছলে যাবে। পড়ে গেলে শব্দ হবে এবং তার পরেরটা তার কল্পনা করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।

ও চেষ্টা না করে সামনেই যে বড় গাছটা পেল ওটাতেই রবার্ট উঠতে চেষ্টা করে। এটা কি গাছ তা কে জানে। গাঢ় অন্ধকার থাকায় গাছটাকে সে চিনতে পারলো না।

রবার্ট একটু একটু করে গাছটার অনেকটা উপরে উঠে গেল। এভাবে গাছে ওঠার শক্তি সে কোত্থেকে পেল তা কে জানে! গাছে যা উঠেছে তা ছোট বেলাতেই। হয়তো কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে সাহায্য করে চলেছে এবং এদিকে কেউ যে পাহারায় থাকবে না তা যেন কল্পনাই করা যায় না। এও তার সৌভাগ্যের পরিচয়। রবার্ট গাছের অনেকটা উপরে উঠে এসেছে। এখান থেকে কারুর পক্ষে ওকে দেখা সম্ভব নয়, যদি না কেউ বলে দেয়। এভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল। এবার রবার্ট দেখতে পায়, দরজার কাছে দু'জন পাহারায় রয়েছে। সে আসার সময় দরজাটা ভালো করে ভেজিয়ে দিয়ে এসেছিল। প্রথমটা সে ওদের দেখতে পায়নি। ওরা সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই জবালতে, সেই আলোতে সে ওদের দেখতে পায় এবং সে যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, সেই দরজার একটু দূরে ওরা রয়েছে। অর্থাৎ যে দরজা যাতায়াতের জন্য খোলা থাকে, সেটা সেইরকমই আছে। কারণ ওখান দিয়ে বেরুতে গেলে চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। জেনে শুনেও ঝুঁকি কেউ নেবে না।

একটু পরে রবার্ট দেখতে পায়, দু'জন লোক সেই নির্দিষ্ট গাছের সামনে এসে দাঁড়ায়। ওদের হাতে কোদাল এবং সেই কোদাল দিয়ে বড় গাছের তলাটার কাছটা খুঁড়তে থাকে। অর্থাৎ তাকে কবর দেবার প্রস্তুতি চলছে। ভাবে, আর একটু দেরি হলেই হয়ে গিয়েছিল। ঠিক সময় বুঝে সরে পড়তে পেরেছে। এখন শেষরক্ষা করতে পারবে কিনা তা কে জানে।

এরপর রবার্ট ভাবে, ওরা যখন ঘর ফাঁকা দেখবে তখন? তখন সারা থানা ওরা তোলপাড় করবে। আর এও বুঝতে ওদের বাকী থাকবে না যে, সব কিছু জেনেই গা ঢাকা দিয়েছে। নইলে এভাবে কখনই সরে পড়ার কথা নয়।

ওদিকে গাছে উঠতে গিয়ে রবার্টের প্যান্ট এবং ফুলহাতা সোয়েটারের কয়েকটা জায়গা ছিঁড়ে গেছে। শরীরের কয়েক জায়গায়ও ক্ষত বিক্ষত। কোথাও জবালা করছে। দু' এক জায়গা দিয়ে রক্তও পড়ছে। তা পড়ুক।

এ সব দিকে রবার্টের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধু সে এক নাগাড়ে ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করে চলেছে।

একটু পরে পাহারাদার দু'জন ভেতরে চলে যায়। রবার্ট এসব উপর থেকে

দেখছে। তবে ওরা কারা তা ঠিক সে অন্ধকারে বুঝতে পারে না। ধরে নেয়, ঐ চার জনের মধ্যে দু'জন হবে।

ওরা ভেতরে চলে যেতে আর একজন থানায় প্রবেশ করে। তাকে কেউ দেখতে পায় না, কারণ সবাই রবার্টকে কবর দেওয়ার কাজে ব্যস্ত আছে। সে হলো সাইমন। ওর বাইরের ডিউটি ছিল। ও সবে এখানে বদলী হয়ে এসেছে। কোয়ার্টার পায়নি। ফলে মার্শালের পাশের ফাঁকা ঘরটা ইদানীং ব্যবহার করছে। যে ঘরটা একটু আগে রবার্ট ব্যবহার করেছিল।

সাইমন ঘরে ঢুকে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে এবং ঘরে মশা থাকায় আপাদ-মস্তক চাদর দিয়ে ঢেকে নিল।

রবার্ট ভাবে, ও লোকটা থানায় ঢুকে কোথায় গেল? তার তো কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। লোকটা কি কর্পূরের মত উবে গেল? তা কি করে হবে?

রবার্ট শুনেছে, মানে মার্শাল তাকে বলেছে যে, এ থানায় আরো একজন অফিসার আছে। সে এখন ছুটিতে আছে। নইলে সেই তাকে ভ্যানে করে পৌঁছে দিত। বিনয়ের অবতার।

রবার্ট ভাবে, সেই অফিসার এলো নাকি, না অন্য কেউ। তবে তার দৃঢ় ধারণা, যেই আসুন না কেন, মার্শাল ঠিক তাকে দলে টানবে। টাকা দেবে, ব্যস, আর তো কোন অসুবিধে নেই। যেমন সে একে একে এদের সবাইকে দলে টেনেছে।

ও কথা রবার্ট আর ভাবতে পারছে না। অন্যদিকে তার চোখ গেল এবং যেতে কতকটা বাধ্য হলো।

গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে। গর্ত করেছে জর্জ এবং বেকার এবং ওদের কাছে এসে প্রায়ই তদারকি করে যাচ্ছে মাইকেল ও হেনরী।

রবার্ট ভাবে, এবার বুঝি সে ধরা পড়ে গেল। সে উপরে বসে ওদের স্পষ্ট দেখতে না পেলেও ওদের চাপা কথাবার্তা সে শুনতে পাচ্ছে এবং তাতে সে বুঝতে পারছে, এবার ওরা ঘরে যাবে। তাকে ওরা ঘরে দেখতে না পেলে থানা একবারে লণ্ডভণ্ড করে দেবে, আর তখনই যদি···। সে আর কিছু ভাবতে পারছে না। তার মাথা আর কোন কাজ করছে না। হাত-পা কাঁপছে। মাথা ঝিমঝিম করছে একটু আগে গাছ থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল।

একটু পরে ঘটে গেল একটা পৈশাচিক কাণ্ড। মাইকেল এবং হেনরী ভূতের মত মার্শালের পাশের ঘরে ঢুকে সাইমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্দয়ভাবে ছুরি চালাতে থাকে? দেখতে দেখতে ও নেতিয়ে পড়ে। মাথায় ও বুকে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে।

ওরা এটাই চেয়েছিল। এরপর সাইমন কোন সাড়া শব্দ না করতে ওরা

ওকে ধরাধরি করে নির্দিষ্ট গাছের তলায় খুঁড়ে রাখা গর্তে কবর দিল এবং মাটিটা ভালোভাবে চাপা দেয়।

কিন্তু ওরা কেউ জানতে পারলো না যে, রবার্টের পরিবর্তে সাইমন খুন হলো। এক দরিদ্র কনস্টেবলের করুন মৃত্যুর কাহিনী আপাততঃ কেউ জানতে পারলো না, আর এভাবে কত অসহায় মানুষ তো প্রাণ দিচ্ছে। খুঁজলে তার নজীর বহু বেরুবে। সে খোঁজার দায় কেউ নিতে যায় না। গেলে লোকে তাকে পাগল বলবে। বলবে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছে। ফলে সমাজ এভাবে চলছে। চলবেও।

রবার্ট ভয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে, কিন্তু সাইমনের জন্য তার দুঃখ হচ্ছে। ও নিজের অজান্তে তার জীবন দিয়ে তাকে রক্ষা করলো। তাই সে ওকে কোনদিন ভুলবে না। ভুললে অন্যায় হবে। সে বেঁচে থাকলে ওর পরিবারকে সাহায্য করবে।

এ মুহূর্তে রবার্টেরে দর্শকের ভূমিকা নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এখনো তার কাঁপুনি থামেনি। একবার তো মনে হচ্ছিল, এই বুঝি সে পড়ে গেল। পড়ে গেলেই আর দেখতে হতো না। সাইমনের পাশেই আর একটা কবর খোঁড়া হতো। আরো যেখানে লক্ষ্য সেই।

ওদিকে ওরা কাজ সমাধা করে ফিরে যেতে মার্শাল সকলকে পিঠ চাপড়ে ধন্যবাদ জানালো এবং তার কথা অনুযায়ী প্রত্যেককে দশ হাজার করে টাকা দিল, আর বলাই বাহুল্য, টাকাটা সে রবার্টের অ্যাটার্চির টাকা থেকে দিয়েছে এবং সকলকে আবার সাবধান করে দিল যে, এই খুনের ব্যাপারে কেউ যেন জানতে না পারে, পারলে কি হবে তা সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো।

সকলে এক বাক্যে সায় জানিয়ে বললো যে, তারা কখনোই বোকার মত এ কাজ করবে না। স্যার যেন এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

এরপর মার্শাল উইলিয়াম এবং এন্ড্রুকে দুটো বিশেষ কাজের ভার দেয়। এরা থানার ইনফরমার। এদের সে পরে পুষিয়ে দেবে। তাতে এরা রাজী হয়।

তারপর ওরা চলে যেতে থানায় যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা সহসা নেমে আসে। দিনের আলো এখনো ফোটেনি, তবে পূবদিক একটু একটু করে পরিষ্কার হতে সবে শুরু করেছে। পাখির মিষ্টি ডাক ভেসে আসছে। হাওয়ার হিমের পরশ।

রবার্ট ভাবে, এইবেলা গাছ থেকে নেমে পড়ুক। তবু তার ঠিক সাহসে কুলোয় না। পর মুহূর্তে ভাবে যদি সে ধরা পড়ে যায়। ধরা পড়ে গেলে অবধারিত তার স্থান হবে কবরে। স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত এ থেকে তাকে বাঁচাতে পারবে না।

এরপর রবার্ট ভাবে, এখানে থাকা আর মোটেই নিরাপদ নয়, কারণ দিনের আলো ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে সে চোখে পড়ে যাবে। এ কথা ভেবে সে ঘাড় উঁচু করে চারদিকটা ভালো করে দেখে নেয়। না, ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই। এমন কি সদর দরজায় পর্যন্ত কেউ পাহারায় নেই।

তারপর রবার্ট ভগবানের নাম স্মরণ করে অতি সাবধানতার সঙ্গে গাছ থেকে নেমে চুপিসারে সদর দরজার কাছে গিয়ে পড়ি কি মরি হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে থাকে। জানে না এ শক্তি সে কোথা থেকে পাচ্ছে। তার বুক হাঁপরের মত লাফাচ্ছে। জোরে জোরে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ভাবে, এই বুঝি জ্ঞান হারিয়ে রাস্তার মাঝে লুটিয়ে পড়বে। তবু তার ছোটার বিরাম নেই। তবে থানার এলাকা পেরিয়ে যেতে সে আস্তে ছুটছে। সে আর পারছে না।

এরই মাঝে একবার রবার্ট পিছন ফিরে দেখে নেয় যে, কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না। তাহলেই সে গেছে। অ্যাটাচি'র কথাও সে গুলি মেরে দিয়েছে। এখন তার প্রাণ বাঁচানো আগে দরকার। বাঁচলে অমন টাকা ঠাকুরের দয়া থাকলে আবার রোজগার করতে পারবে। আগে নিজে বাঁচুক তারপর টাকা।

না, রবার্টকে কেউ অনুসরণ করছে না। তবে রাস্তা দিয়ে ঐভাবে দৌড়তে অনেকেই তাকে দেখছে। হাসছে, কেউ হয়তো তাকে পাগল ভাবছে।

রবার্ট ভাবে, তা ভাবুক। সত্যি তো, তার এখন পাগলের দশা। তাছাড়া, এক দিনেই তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। তার উপর দু'তিন দিন সে দাড়ি কামাতে পারেনি। ফলে তাকে এখন পাগলের মতই দেখাচ্ছে।

না, রবার্ট আর দৌড়তে পারছে না। পিছনে যদি কেউ আসে তো আসুক। পড়ুক সে ধরা। না বসে সে আর পারছে না। তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার দাখিল হয়ে এসেছে। এরপর পথের পাশে একটা স্নাক্স বারের টুলে ধপাস করে বসে পড়ে। তাতে বারের মালিক চমকে যায়। সে একটু ধমকের সুরে বলে, এখানে বসলেন কেন? কথার সঙ্গে তার একটা তাচ্ছিল্যের ভাবও ঝরে পড়ে। ভাবে, কোথাকার কোন উটকো লোক তার ঠিক নেই। আর পাগল কি না তাই বা কে জানে! চেহারা দেখে তার অন্য কিছুই মনে হচ্ছে না।

রবার্ট হাত জোড় করে, পাঁচটা মিনিটের জন্য দয়া করে আমায় একটু বসতে দিন। তারপরই আমি চলে যাবো। আপনাকে আমি বিরক্ত করবো না।

লোকটি কি ভাবলো তা কে জানে। তবু একটু কড়া সুরে বললো, তার বেশী যেন বসবেন না। এটা বিক্রীর সময়।

—ঠিক আছে রবার্ট পকেট থেকে রুমাল বার করে হাত, মুখ, গলা, ঘাড় ইত্যাদি মুছতে থাকে।

এরপর একটু সামলে উঠে রবার্ট বারের লোকটিকে বলে, আমাকে একটু উপকার করবেন ?

'উপকার' শব্দটা রবার্ট ব্যবহার করতে লোকটি ভাবে, বোধহয় বিনা পয়সায় তার কাছে কিছু হয়তো খেতে চাইবে, নয়তো ধার চেয়ে বসতে পারে। অথবা অন্য কিছু সুবিধে, আর এরকম কিছু ভাবা তার পক্ষে আশ্চর্যের কিছু নয়। ওর চেহারার যা ছিরি সে কেন অনেকেই এ কথা ভেবে বসবে।

লোকটি রবার্টের কথায় তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। অর্থাৎ সে ওর দিকে না তাকিয়ে ওমলেট ফ্রাই প্যানে ছাড়তে ছাড়তে বলে, বলুন, আপনি কি বলতে চান ?

—আমায় জেল পুলিশের অফিসটা কোথায় তা দয়া করে একটু বলে দেবেন, রবার্ট বসতে পেয়ে একটু স্বস্তিবোধ করছে। তবে বুকের ধড়ফড়ানি কমতে তার সময় লাগবে।

—ওখানে গিয়ে আপনি কি করবেন ?

—দরকার আছে ভাই, রবার্ট স্নাক্স বারের খাবারের দিকে তাকায়। তাতে তার খিদে দ্বিগুণ বেড়ে যায়। খিদেয় যেন তার নাড়ী ভুঁড়ি ছিঁড়ে খাবার উপক্রম। সেই কাল বিকেলে কফি খেয়েছিল। তারপর আর কিছু খায়নি। তবু এখন কিছু মুখে দেবার মত আর মানসিকতাও নেই।

—আপনি এ রাস্তা ধরে সোজা চলে যাবেন, তারপর ডান দিকে বাঁক নেবেন এবং সামান্য একটু এগিয়ে গেলেই জেল পুলিশ অফিসটা দেখতে পাবেন ?

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই! লোকটির প্রতি রবার্টের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। এখন তার কাছে এ সাহায্যের দাম অনেক। ভাবে, আর একটু এখানে বসেই উঠে পড়বে। আবার কে কখন এসে পড়ে তার কিছু ঠিক নেই। তার সময় এখন খারাপ চলছে। তবু তো আবার প্রাণেও বেঁচে গেল। তবে ভালোভাবে বাড়িতে পেঁছিতে পারবে কি না তা কে জানে।

রবার্টের সহসা সুশানের মুখখানা ভেসে ওঠে। ভাবে, টাকাটা তার চাই। সেই সঙ্গে সাইমনের মৃত্যুর ব্যাপারটারও তদন্ত হোক। এটা তার করা একান্ত দরকার। কারণ ওর জন্যই সে প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। তাই এখন টাকার চেয়েও সাইমনের ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো খুবই প্রয়োজন।

তারপর আর একটু বসে রবার্ট টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং লোকটির দিকে তাকিয়ে বলে, চলি, অনেক ধন্যবাদ।

—ঠিক আছে, বলে লোকটি আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এরপর লোকটির নির্দিষ্ট মত রবার্ট জেল পুলিশ অফিসে পেঁছে যায় এবং সে অফিসে প্রবেশ করে।

অফিসের কর্মীরা রবার্টকে দেখে অবাক হয়ে যায়। জামা-কাপড়ের অবস্থা

শোচনীয়। মাথার চুল উস্কো খুস্কো ও এলোমেলো। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। পায়ে সু থাকলেও তাতে কাদা লেগে রয়েছে।

ওরা ভাবে, লোকটা হয়তো পাগল, নয়তো নিষিদ্ধ পল্লী থেকে এই মাত্র নেশা ভাঙ করে উঠে এসেছে।

ওদের মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠেছে। ওরা এখন আর রবার্টের দিকে তাকাচ্ছে না, কারণ এ ধরণের লোক তারা অহরহ দেখছে, এসব এদের কাছে নতুন কিছু নয়। ফলে যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

রবার্ট এতে রীতিমতন অসহায় বোধ করে। তবু এসব এখন দেখলে তার চলে না, আর ওদের ব্যবহার দেখে সে ওদের মনোভাব খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে। তাতে সে ওদের ঠিক দোষ দিতে পারে না।

রবার্ট এবার একজন কর্তব্যরত পুলিশের কাছে গিয়ে বলে, আমি একবার এস. পি. সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই

—এস. পি. সাহেব? পুলিশটি মনে মনে হেসে ওঠে। সাহেব যেন তোমার বাবার চাকর। আর এই সাত সকালে এসে উনি তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। তার মনের তিক্ততা দূর হয় না।

—হ্যাঁ ভাই। বড় জরুরী দরকার।

—কি দরকার? পুলিশটি তার পুলিশী মেজাজে বলে।

—কথাটা খুবই গোপনীয়। আমি শুধু তাকেই বলতে চাই। পুলিশটি রুক্ষ গলায় জানায়, তিনি এখন নেই।

অ্যাডিশন্যাল এস. পি. আছেন?

রবার্টের কথা বলার ধরন দেখে পুলিশটি একটু ভড়কে যায়। তাই সে একটু সমীহ করে কথা বলে। জানায়, হ্যাঁ, উনি আছেন।

—আমি তার সংগে দেখা করতে চাই।

—একটা স্লিপ দিন।

—আচ্ছা। একটা স্লিপ পাবো?

—নিশ্চয়ই, পুলিশটি মাথা নাড়ে। বলে সে পাশের টেবিল থেকে স্লিপের প্যাড থেকে একটা স্লিপ ছিঁড়ে রবার্টের দিকে এগিয়ে দেয়।

—থ্যাংক ইউ ভাই। রবার্ট হেসে স্লিপটা নিয়ে বলে, দয়া করে আপনার ডট পেনটা দেবেন?

—এই নিন।

—এরপর রবার্ট স্লিপে তার পরিচয় লিখে ডট পেনটা পুলিশটিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে, ভাই আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন।

—এতে উপকারের কিছু নেই। এটা আমার ডিউটি। বরং এ কাজ না করলেই উপরওয়ালার কাছে আমার নামে রিপোর্ট হয়ে যাবে। আপনি

ভিজিটার্স' রুমে বসুন। দেখছি, উনি এখন ফ্রি আছেন কি না।

—ভাই, একটু চেষ্টা করবেন।

—আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না। আপনি এসেছেন বিনা কারণে নিশ্চয়ই নয়।

—সে তো নিশ্চয়ই।

—শুধু দেখবেন ব্যাপারটা যেন একবারে খেলো না হয়।

—না, না, তা হবে না, রবার্ট বুঝতে পারছে, পুলিশটি কেন তাকে এ কথা বললো।

—আপনি বসুন, আমি আসছি।

—ঠিক আছে রবার্ট ভিজিটার্স' রুমে না গিয়ে বাইরেই অপেক্ষা করতে থাকে। কথাটা না জানানো পর্যন্ত সে স্বস্তিবোধ করছে না। এবার সে বাড়িটার দিকে তাকায়। বাড়িটা দোতলা। তবে আকারে বিরাট। অনেক ঘর। বাড়ির সামনে সুন্দর সাজানো গোছানো বাগান। তারই এক ধারে পার্কিং জোন এবং গ্যারেজ রয়েছে। আর বেশ কয়েকটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় রবার্ট পুলিশটির কাছে একরকম ছুটে গিয়ে বলে, আপনি স্যারকে আমার হয়ে বলবেন। ব্যাপারটা ভীষণ জরুরী। ওঁনার সঙ্গে আমার দেখা করা খুবই জরুরী। নইলে আমি এভাবে কখনোই আসতাম না।

—দেখি, বলে পুলিশটি অ্যাডিশন্যাল এ. পি.-র কামরার দিকে এগিয়ে যায়।

অ্যাডিশন্যাল এস. পি. মিঃ মরিসন এখন ঘরে একা। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছে। প্রায় ছ' ফুটের কাছে লম্বা। তেমনি মজবুত স্বাস্থ্য। চওড়া কপাল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

পুলিশটি মরিসনের চেম্বারে স্লিপটা দেবার পরই তাতে চোখ বুলিয়ে মরিসন বলে, ডেকে পাঠাও।

—আচ্ছা স্যার।

পুলিশটি রবার্টের কাছে এসে জানায়, স্যার আপনাকে যেতে বলেছেন। আপনি যান।

কৃতজ্ঞতার চোখে রবার্ট পুলিশটির দিকে তাকিয়ে নির্দিষ্ট চেম্বারের দিকে এগিয়ে যায় এবং সে চেম্বারে প্রবেশ করে, গুড মর্নিং স্যার।

—মর্নিং। আপনি এখানে কি চান? মরিসনের চড়া গলা।

—স্যার, একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি। আপনি দয়া করে আমার কথা শুনুন। তাহলেই আমার ব্যাপারটা আপনি বুঝতে

পারবেন।

—যা বলার খুব তাড়াতাড়ি, বলুন।

—থ্যাংক ইউ স্যার! রবার্ট চেয়ারে বসে এবং ঘরে কেউ না থাকায় সে মরিসনকে সমস্ত কিছু জানায়।

মরিসন রবার্টের কথাটা শুনে বিস্ময়বোধ করে। তবু যাচাইয়ের ভঙ্গিতে বলে, সাজানো ব্যাপার নয়তো।

—সাজানো ব্যাপার?

—হ্যাঁ, মরিসন আমি তাহলে এত দূরে ছুটে আসবো কেন?

—তা আপনিই জানেন।

—স্যার, আপনি বিশ্বাস করুন। এর প্রতিটা কথা সত্যি। এর একটা অক্ষরও মিথ্যে বলছি না।

—আপনি যে থানায় টাকাটা জমা দিয়েছেন, তার কোন প্রমাণ আপনার কাছে আছে? মরিসন রবার্টকের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

—প্রমাণ? রবার্ট ভাবে, এই রে, টাকা জমা দেবার স্লিপটা তার পকেটে আছে তো? সেটা তো আদৌ তার দেখা হয়নি। ওটা না থাকলে কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না।

—হ্যাঁ, প্রমাণ চাই।

—আছে স্যার, বলে রবার্ট মার্শালের দেওয়া মানি রিসিটটা এ পকেট সে পকেট হাতড়াতে থাকে, কিন্তু কোথায় সেই মানি রিসিট? পাচ্ছে না। বুক পকেটে নেই, মনে হয় সে ওখানেই রেখেছিল। এখন স্যারকে দেখাতে না পারলে তার কথা বিশ্বাস করবে না। শুধু স্যার কেন কেউই তার কথা মানবে না।

শেষে রবার্ট অন্য একটা পকেট থেকে দলামোচা অবস্থায় একটা কাগজ বার করে, স্যার বোধহয় পেয়েছি।

—কই দেখি।

হ্যাঁ, এটাই মানি রিসিট। সেদিকে তাকিয়ে মরিসন আর অবিশ্বাস করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে সে চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে বেল বাজায়।

সেই পুলিশটি চেম্বারে ঢোকে, স্যার।

—এখুনি গাড়ি বার করতে বলো। মরিসন জানায়। আর ও. সি. কে পাঠিয়ে দাও।

—আচ্ছা স্যার।

প্রায় সংগে সংগে ও. সি. ঘরে প্রবেশ করতে মরিসন বলে। ডেনজারাস কেশ, এখুনি তুমি আমার সংগে চলো। সংগে গাড়ি ভর্তি পুলিশ নাও।

—ইয়েস স্যার।

তারপর মরিসন উপরওয়ালাকে ফোন করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সদল বলে বেরিয়ে পড়ে এবং গিয়ে সে নির্দিষ্ট থানায় হাজির হয়। তার আগে সারা থানা পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে, যাতে কেউ পালাতে না পারে। সবাইকে কড়া পাহারায় থাকতে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মরিসনকে দেখতে পেয়ে মার্শাল থানা থেকে এক রকম ছুটে বেরিয়ে আসে, গুড মর্নিং স্যার। তবে ঐ কথা বলার সংগে সংগে তার প্রায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা। স্যারের সংগে রবার্টকে দেখে। ভাবে তাহলে ওরা কাকে মেরে কবর দিল।

কোন রকম স্বাগত জানাবার বদলে মরিসন মার্শালের দিকে ঘৃণিত চোখে তাকিয়ে বলে, তুমি আমার সংগে এসো। তোমার সংগে কথা আছে। তা ডেড বডি কোথায় রেখেছো ?

মার্শাল সহসা যেন বোবা হয়ে গেছে। সে কোন কথা বলতে পারছে না। চোখের সামনে সব কিছু যেন অন্ধকার দেখছে। পায়ের তলায় মাটি যেন আর খুঁজে পাচ্ছে না।

—বলো! চুপ করে রইলে কেন? মরিসন সহসা বাঘের মত গর্জে ওঠে।

—স্যার, স্যার ···মার্শাল তোতলাতে থাকে।

—ইউ স্টুপিড! বলে মরিসন মার্শালের কলারটা চেপে ধরে রবার্টের দিকে তাকায়। মিঃ রবার্ট কোথায় ডেড বডি কবর দেওয়া হয়েছে।

—স্যার, ঐ গাছটার তলায়, রবার্ট আংগুল তুলে নির্দিষ্ট গাছটা দেখায়।

—থ্যাংক ইউ! এরপর মরিসনের নির্দেশে দু' তিন জন সংগে সংগে কোদাল নিয়ে সেই গাছের তলাটা খুঁড়তে থাকে। এবং কিছু পরেই সাইমনের বিকৃত লাশটা বেরিয়ে পড়ে।

ঐ বিকৃত লাশ বেরিয়ে পড়ার সংগে সংগে মার্শাল, জর্জ, বেকার, মাইকেল এবং হেনরীকে গ্রেপ্তার করা হলো।

মার্শালকে থানায় থাকতে হয়েছিল অন্য আর একজন অফিসার অফিসে না থাকায়। সে থাকবে না তা মার্শাল জানতো। সে ম্যানেজ করে ছুটি নিয়েছে।

আর জর্জ, বেকার মাইকেল এবং হেনরীও থানায় ছিল। কারণ সারা-রাতের ধকলের পর যে যার থানা সংলগ্ন কোয়ার্টারে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফলে এদের গ্রেপ্তার করতে কোন অসুবিধে হলো না।

এবং মানি রিসিটের টাকা অনুযায়ী মরিসন মেলাতে গিয়ে দেখে, চল্লিশ হাজার টাকাই নেই। অর্থাৎ রবার্টের কথামত সব কিছু মিলে গেল। ঐ

চল্লিশ হাজার টাকা ওরা চার জনে পেয়েছে এবং তাও ওদের কাছ থেকে পাওয়া গেল। অর্থাৎ রবার্টের তিন লাখ টাকাই উদ্ধার হলো।

হেনরীরা ভাবছে ছিঃ, ছিঃ, তারা কিনা সাইমনকেই খুন করলো! ওর ডিউটি হয়ে গেলে ও ওঘরে শোয়, কারণ সবে বদলী হয়ে এসেছে। তাই এখনো কোয়ার্টার পায়নি, হায়রে! তারা কিনা ওকেই খুন করলো! এ আফসোস তাদের কোনদিন যাবে না। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ওর কথা মনে হবে।

ওদিকে থানার চারপাশে ভিড় জমতে শুরু করে দিয়েছে। কৌতূহলী জনতার প্রশ্ন, এ বন্দি কিসের জন্যে? আর এ খুন কি না থানার মধ্যেই হলো!

তারপর মরিসনের নির্দেশে সবলকে পুলিশ ভ্যানে তোলা হলো এবং কৌতূহলী জনতার দৃষ্টিকে সজাগ করে একরাশ ধুলো উড়িয়ে ভ্যানটা চলে গেল।

এখন প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। একটু আগে সামান্য ঝিরঝিরে ধরণের বৃষ্টি হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। দু' একটা তারাও দেখা যাচ্ছে। তবে চাঁদ মেঘের আড়ালে ধরা দিচ্ছে আবার বেরুচ্ছে হয়তো একটু পরে আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ বেরিয়ে পড়বে।

রবার্ট তার কাহিনী শেষ করে সবার দিকে তাকায়। সবার মুখে একরাশ উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছে এবং সবাই এক বাক্যে স্বীকার করলো, ঈশ্বরের অসীম করুণায় আপনি প্রাণ ফিরে পেয়েছেন।

রবার্ট এর জবাবে কিছু বললো না। শুধু একটুখানি হাসলো। তবে তার হাসিটা ঠোঁটের ফাঁকে ধরা দিয়েই মিলিয়ে গেল। তার সাইমনের কথাটা বড্ড বেশী করে মনে পড়তে থাকে।

সমাপ্ত